প্রকাশিকা
শ্রীমতী মঞ্জুষা মুখোপাধ্যায়
শঙ্করভবন, উত্তরপাড়া, হুগলী

প্রকাশ : ১৯৫৮

মুদ্রণে
শ্রীমতী বাণী ঘোষ
শ্রীতারা প্রিণ্টিং সেণ্টার
১এ, কার্তিক বোস লেন,
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

ভ্রমন কাহিনী

নীল নীল
নীল জল পেরিয়ে

তারপর রাজপুত্র বেরুলেন, সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে তিনি যাবেন অচিনপুরের রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাতে।

রাজপুত্র নয়, সাধারণ কেরানীযাবে অন্তত এক সমুদ্র পেরিয়ে আজন্মলালিত স্বপ্নের দেশে। স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নও বটে। কেরানী যাচ্ছে সমুদ্র পেরিয়ে। তাও হংকং-সিঙ্গাপুর নয়, একেবারে ইংলণ্ড-আমেরিকা—ফ্রান্স!

চারিদিকে চাপা, প্রায় নিঃশব্দ গুঞ্জন অফিসের টেবিলে টেবিলে, পাড়ার রকে রকে। একজন বললে, 'নিজের সঙ্গে বিদেশেরও জাত মারবে! এ কোনো দিন হয়েছে। না হতে পারে! হওয়া উচিতও নয়, তবু যদি কেউকেটা, বড়বাবু হতো। সবাই তো খাওয়া পরা, মেয়ের বিয়ে, বাড়ী করতেই প্রাণান্ত। শিকে ছেঁড়ে বেড়ালের ভাগ্যে। আচ্ছা ও বেড়াল হলো কি করে?" গুঞ্জনের শেষ নেই।

স্বপ্ন। সেক্সপীয়ার, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের দেশ। দমদম থেকে দিল্লী দুঘণ্টায়। সেখান থেকে লণ্ডনের হিথরো বিমান বন্দর প্রায় আট ঘণ্টা। কাস্টমস সেরে ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে দেখি সঞ্জয়দা-সঞ্জিত ও পরিজনেরা হাজির আমাদের সাদর অভ্যর্থনা, কুশল বিনিময়ের পর কুইন্সবেরীর বাসভবনে গিয়ে শুরু হলো গল্প। গল্পের মধ্যেই সূর্য অস্ত গেল রাত নটায়। এ আসা স্ত্রী-মঞ্জুষা, বুলবুলি-গোরা-দেবদেব-টুনটুনি-মামন্তুর আগ্রহে সম্ভব হোল।

লণ্ডনে দেখলাম হার্ভাড্। নেহেরুর যৌবন-সঙ্গী। পরদিন দেখলাম মাদাম তুঁষোর যাদুকরী মিউজিয়ামে মোমের স্ট্যাচু! কয়েকটি বেশ জীবন্ত। এখানে একটি লোক স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়ানোয় মূর্তি ভেবে ভুল করেছিলাম প্রায়। ভাগ্যিস চোখের পাতা নড়লো। সবাই যা করে আমি করলাম ঠিক তার উল্টো। সবাই স্ট্যাচুকে জীবন্ত ভাবে, আর আমি জ্যান্ত মানুষকে স্ট্যাচু ভাবলাম।

এ এক উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। পৃথিবীর সব বিখ্যাত লোকের মূর্তি যেন এখানে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। সেদিন ওখান থেকে বাড়ি ফিরতেই রাত হয়ে গেল। রাত্রে বিশ্রাম।

সূর্য উঠল পরদিন জবাকুসুমসংকাশং হয়ে, প্রাণদায়িনী হয়ে যা জীবনে আদ্যন্ত বিস্তৃত। এদিন বাসে লণ্ডন শহর ঘুরলাম। অনেক কিছুর মাঝে Tower of London-এ দেখলাম রাজারাণীর ব্যবহৃত স্বর্ণখচিত পাত্র, জড়োয়া মুকুট আর অন্যান্য বিচিত্র মহামূল্যবান গয়না।

চরৈবেতী চরৈবেতী, যতদূর নিয়ে যাবেন তত দূরই। গেলাম সঞ্জয়দার বাড়ী Oxford-এর শহরতলীতে। এখানেও বাড়ীর সামনে ফুল বাগান। উপরে নীচে দুটি করে ঘর, রান্নাঘরের পাশে খাওয়া ও বসার ঘর। ইঁট কাঠ মিশিয়ে বাড়ী কার্পেটে মোড়া আগাগোড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। টিভি, ফ্রিজ বাসন-ধোয়ার, কাপড়কাচার কল, মাইক্রো ওয়েভ ও গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা। বাড়ীর পাশে গাড়ী খোলা থাকে, গ্যারেজ নেই। পরিচারক-পরিচারিকা নেই। বৈদ্যুতিক যন্ত্র আছে ঘর সাফ করার ঘাস কাটার, মায ঝুল ঝাড়ারও।

পরদিন Witney হয়ে Bourton-on-the Water আদর্শগ্রামে বেড়াতে গেলাম। আধা শহর ধাঁচের। রুক্ষ মালভূমির মধ্যে ওয়েসিস হয়ে শহুরে লোকদের আনন্দ দেয়। ফেরার পথে উল্লেখযোগ্য Witney-র Mall। একটি উঁচু ছাদের তলায় মাছ-মাংস শব্জী ও মনোহারী দ্রব্যের সুলভ সম্ভার।

রাতে বাড়ি ফিরে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে গল্প। দেশ থেকে এত দূরে বেশ লাগে। কখনও দেশের কথা তারই মধ্যে আমাদের ষ্ট্রাটফোর্ট-অন-অ্যাভনে যাওয়া হবে কিনা সেই সংশয়, আবার লণ্ডনের রাস্তার পুলিশ—মিলেমিশে সব এক হয়ে যায়।

পরের দিন Oxford University বাইরে থেকে দেখে গেলাম Oxford মিউজিয়াম। বেরিয়ে কিছু কেনাকাটা সেরে গেলাম গ্রাম্য pub-এ। এখানে মদ্যপান করাটা ভারতীয়দের কাছে স্পোর্টস-এর মত। না করাটা কি জানতে পারিনি ? যথারীতি ট্রেন ও রাস্তার মত এখানেও দেখলুম ছেলেমেয়েদের নিত্য নূতন প্রেমের পশরা পাতা।

লণ্ডনে ফিরে পরদিন গেলাম British Museum-এ। এখানে মিশরের প্রস্তর মূর্তি নিয়েএকটি বড় বিভাগ আছে। প্রাচীন সভ্যতার বেশ কিছু নিদর্শন দেখলুম ; দেখলুম মানুষের প্রাচীনতম অস্থি। গেলাম Art Museum-এ। এখানে বহু প্রাচীন তৈলচিত্র আছে। এরা শিল্পের মূল্য বোঝে। পুরনো ছবির প্রয়োজনীয় 'রেস্টোরেশন' যে কত অমূল্য শিল্পসম্পদকে রক্ষা করতে পারে তার পরিচয় এখানে এসে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কত বিশেষজ্ঞ রয়েছেন

এখানে। ভেবে দুঃখ হয় আমাদের দেশে এ উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় কত নগন্য।

এখানে ভেজালের কথা কল্পনাও করতে পারে না কেউ। এ বিষয়ে মজার অভিজ্ঞতা হল একদিন। সঞ্জিতকে বলেছিলাম, আমাদের দেশে ভেজালের মত এদেশে সবই খাঁটি। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে তদীয় পুত্রের প্রশ্ন, Daddy. পিশেমশাই 'ভেজাল' বলল, মানে কি? please explain! Daddy আমতা আমতা করে যা বলল তা far from satisfactory—কারণ ভেজাল কথাটা ব্যবহারিক জীবনে এদেশে প্রায় অভিধান বহির্ভূত। ফলে বাবার জানা থাকলে ও আজন্ম ওদেশে বসবাসকারী ছেলেকে বাবা কিছুতেই বিষয়টা বোঝাতে পারে না। এও এক অভিজ্ঞতা!

এখান থেকে নিউইয়র্ক। আবার প্লেনে দীর্ঘ যাত্রা। মেঘ ভেদ করার সময় বাম্পিং-এ মনে হোল জীবন পদ্মপাতায় জল, টলমল করছে। শুধু নিয়মের রাজত্বে আছি। তাই কিছু হচ্ছে না। একটু সাহস পেলাম Air Hostess-দের দৈনন্দিন জীবনচর্যা মনে কোরে। কিন্তু তারাও ওঠানামার সময় সামনে থাকে না।

Newyork-এ কেনেডি Airport-এ নামলাম। Custom সেরে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে দেখি খুড়তুতো ভাই নীল দাঁড়িয়ে সম্ভাষণের হাসি নিয়ে। ওর বড় গাড়ীতে সপরিবারে উঠে গেলাম প্রায় ষাট মাইল দূরে ওর New Jursey-র বাড়ীতে। নীলের স্ত্রী কেয়া ও মেয়ে মিলানী বেরিয়ে এলো কলিং বেল বাজতেই।

ওখানে শুনলাম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ গুরু মহারাজ কাছেই রয়েছেন। ফোনে appointment করে গেলাম, অপেক্ষা কোরলাম গুরুভাইদের সঙ্গে গল্প করে। ইংলণ্ড থেকে লোক এসেছে গুরুমহারাজকে নিয়ে যেতে। যাবার পথে মহারাজ দাঁড়ালেন ও প্রণাম করতে আশীর্বাদ কোরলেন। মন ভরে গেল, সাহস পেলাম।

দ্বিতীয় দিনে আবার প্লেনে এ সানফ্রানসিসকো। যন্ত্রসাথী মেঘের প্রায় দুর্ভেদ্য বর্ম ভেদ করে উঠলো নীলিমায়। ওপরে, আরও ওপরে মেঘের পরে মেঘ সরিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে নীচে তাকিয়ে দেখি শুভ্র-কিরীটি পর্বতচূড়া; তুষার ঝড় মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগদিগন্তে! রুদ্রের নিদারুণ সেই খেলায় মনে হচ্ছে নীচের পৃথিবী বাসুকীর ফণার দোলায় বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ভাবলাম এ কোন ভগীরথ গঙ্গাবতরণের চেষ্টা করছে শিব-সুন্দরের যথাযথ আরাধনা না করে। প্লেনেরকাঁপুনি আরও বেশী হওয়াতে আতঙ্কিত

মনে আশুতোষের স্মরণাপন্ন হোলাম, বলা হয় তাঁকে স্মরণ করলে তিনি রক্ষা করেন। কিছু পরে দেখি নির্মল আকাশে প্রকৃতির আশুতোষ মূর্তি। মনে মনে বললাম, প্রসীদ বরদাভব।

প্লেন নামলো সানফ্রান্সিসকো বিমান বন্দরে। বেরিয়ে দেখি প্রতীক্ষার পর সুজন-মণিকা-আর্য্য-পম্পির স্মিত মুখে দীর্ঘহাসি ও স্বাগত ভাষণ। বাড়ী গিয়ে আলাপ-খাওয়া ও ঘুমের প্রস্তুতি চলল। সবাই শুতে গেল, আমি কলম নিয়ে বসলাম। যখন কিছু মনে হয় তখন উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে লেখা হয় না। মনে দোলে নানা রঙের বৈচিত্র্য, সাহিত্য-সরস্বতীর পায়ে ফুল হয়ে ফুটবে বলে।

মনে হলো প্লেনের নিচে দেখা পৃথিবীর চেহারা, পাহাড়ের সুকুমারী কন্যা ঝর্ণা হ্রদে গিয়ে গা এলিয়ে স্নান করছে। সেই হ্রদের কোনটা থেকে সৃষ্টি হয়েছে নদী, যাবে সে সাগর সঙ্গমে পেরিয়ে নানা বর্ণের মাটি, শ্বাপদশঙ্কুল বন, মালভূমি, মিলতে হবে চির আকাঙ্ক্ষিতে। এরই মধ্যে চলছে জন্ম-মৃত্যু, আসা-যাওয়া নানা ভাবে, নানা রঙের খেলা, বাঁচার খেলা, উদ্বোধনেব খেলাও।

পরদিন শহরতলীর বাসস্থান থেকে সানফ্রান্সিকোতে গেলাম দীর্ঘ ব্রিজ পেরিয়ে। Golden Gate ব্রিজ-পেরিযে ওপারের সমুদ্র-শহরে পৌছোলাম—উঁচুনিচু হওয়া সত্ত্বেও পাহাড়তলীর শহর যে কত সুন্দর হতে পারে এ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উঁচু থেকে বাড়ীর-দল সুন্দর ভাবে নেমে গেছে সমুদ্র স্নানের আশায় বেলাভূমে। যেন একগুচ্ছ ফুল, ফ্রন্সের সুন্দরী-রিভিয়েরার সঙ্গে কেবল যার তুলনা করা যায়। ক্লিক্ ক্লিক, চারিদিকে কত যে ছবি উঠছে আমাদের জানা-অজানা ক্যামেরায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

এই সুন্দর জায়গায় এসে কেন জানিনা হঠাৎ মনে হল এদেশে সকলে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। নিমন্ত্রণ করলে বেড়াতে আসে। অন্নপ্রাশনের পার্টিতে দেখলাম আমাদের থেকে একটু অন্য ছন্দ—আসুন ড্রিঙ্কস! বসুন, ম্যাজিক শো দেখুন, গালগল্প করুন। তারপর প্লেট নিয়ে লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে খান। মনে পড়ে গেল ক্লাউন সেজে এক মহিলা ম্যাজিশিয়ান এসেছিলেন, আমি তাঁকে অন্যদের মত সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম বলে যাবার সময় তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন—হয়তো স্বাভাবিক ভদ্রতা করা নিয়ম বিরুদ্ধ এরকম প্রফেশানালদের সঙ্গে।

একদিন পরে ডিজনিল্যাণ্ড এর পথে বেরুলাম। লস-এঞ্জেলস হয়ে পৌছলাম সেণ্টএ্যানা রাত্রি এগারোটায়। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে পৌছলাম রূপকথার

দেশে ডিজনি ল্যাণ্ডএ। শিশু ও অনেক মানুষের ঘুম কেড়ে নেওয়া জায়গা এই ডিজনি ল্যাণ্ড। গাড়ী থেকে নেমে ট্রলীতে গেটে পৌছলাম। প্রবেশ মূল্য একুশ ডলার। প্রথমে 'টিকির' ঘরে গেলাম—পাখির ডাকের সঙ্গে ভাবপ্রকাশ ও গান মিলে এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান। হণ্টেড্ হাউসে ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা। ভাল লেগেছে ব্যাঙ্ক-অফ-আমেরিকার রূপকথা বিষয়ক অবদান বাচ্চাদের জন্য হলেও। দেখলাম কৃত্রিম পাহাড়ী ট্রেনে চড়ার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা চড়াই-উৎরাইয়ে। এরপর সাবমেরিনে সমুদ্রের নীচের গাছপালা ও নানা রঙের মাছ দেখার অভিজ্ঞতা। মিকির বৈকালিক মার্চ্চ ও রাত্রে ব্যাণ্ড ও আলোক সজ্জাসহ বর্ণাঢ্য মার্চ্চ অনবদ্য। ওপরে মাঝে মাঝেই mono রেল চলছে সাবলীল গতিতে। দোকানে ভালো এবং দামী খাবার খেতে খেতে দেখা যায় পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে আসা দর্শকদের।

পরদিন গেলাম ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে চারতলায় গাড়ী রেখে। দেখলাম action film এর শূটিংয়ে বন্দুকবাজী, বোমাবাজীর মহড়া। ট্রলী করে দেখলাম Newyork শহরের একটি রাস্তার সেট, কিংকং এর ভয়ঙ্কর ব্রিজ নাড়ানোর অভিজ্ঞতা, পুরোনো ব্রিজে উঠে প্রায় ভেঙ্গে পড়ার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। সবজায়গায় চমক দেওয়ার একটা প্রয়াস দেখলাম মাথাপিছু ২৪ ডলারের বিনিময়ে।

বিকালে একদিকের চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটছে সত্তর, আশি, নব্বুই মাইলে—সব গাড়ীরই একই রকম স্পীড, কমালেই দুর্ঘটনার সম্ভবনা। রাত্রি দুটো নাগাদ road side cafe-তে ঢুকলাম খিদে ও ঢুলুনি কমাতে। আবার দৌড় রাত্রি চারটায় পৌছলাম সানফ্রানসিসকোর আশ্রয়ে। রাত্রে সবাই শুতে যাওয়ার পর আমি বসে বসে ভাবছিলাম এখানকার লোকেদের সকলে মনে করে বাস্তববাদী, জানি না আমরা কি! প্রবাসী ভারতীয়রা ভাবে—বাড়ি-গাড়ি আয় নিয়ে ওরা বেশ আছে, এ জন্য দেশের সম্পত্তিকে ওরা অনেকেই তুচ্ছ ভাবে। ওদের সমস্যা দেশে ফেরা-না ফেরা নিয়ে, অবশ্য ওরা মুখে তা স্বীকার করে না। বলে বেশ আছি, ওসব ভাববো retire করার আগে।

পরদিন মধ্য-দুপুরে ষাট সত্তর মাইল গিয়ে দেখলাম sea world-এ ডলফিন তিমির খেলা—টিকিট সতেরো ডলার। আরো আছে মিনি সার্কাস, কুকুর বাঁদরের খেলা ইত্যাদি। এরপর দেখতে গেলাম এখানকার Mall-শপিং সেণ্টারে। নিউমার্কেটের চেয়ে বড় বড় হল, কোথাও বা কয়েকটি হলের সমান

জায়গায় দোকানের সারি। জামা কাপড়, প্রসাধন ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সুলভ সম্ভার এখানে বিস্মিত করে, মুগ্ধও করে। তবে সীমিত ক্রয় ক্ষমতার জন্যে যে দুঃখটুকুও মনের ভেতর উঁকি দেয় এ আনন্দের সময় তাকে একটু কষ্ট করে দূরে সরিয়ে রাখাই ভাল।

এদেশের খাদ্য-কেন্দ্রে খাদ্য ও মনোহারী দ্রব্যের বিপুল সুলভ সমাবেশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। পৃথিবীর সব জায়গার শ্রেষ্ঠ খাদ্য, পানীয় ও মনোহারী দ্রব্যের যেন প্রদর্শনী। এক ডলারে এক কেজি মুরগী ; এক ডলারে দুই লিটার দুধ ; শার্ট আট ডলার থেকে, প্যান্ট চোদ্দ ডলার থেকে ; স্যুট সত্তর ডলার থেকে ; এসব জায়গায় বাড়ী ও গাড়ী মাসে কিস্তিতে চৌদ্দশ ডলারে পাওয়া যায়। পনের/ষোলো হাজারে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মাঝারী গাড়ী ; কুড়ি বাইশ হাজারে বড় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী পাওয়া যায়। গাড়ী-বাড়ি সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক ঘণ্টায় দশ ডলার বা প্রায় মাসে আড়াই হাজার ডলার। আনুমানিক চৌদ্দ থেকে ষোলশ' ডলার মাসিক কিস্তি দিয়ে খেয়ে পরে সাধারণ লোকের বেশ ভাল ভাবেই চলে যায়। বেকাররা পান বেকারভাতা কাজ না পাওয়া অবধি এবং অসহায় বৃদ্ধেরা ভদ্রভাবে বাঁচার সুবিধা।

দিন যায় নানা রঙে, নানা বর্ণে তবে ঠিক হোলীর মত নয়,—আনন্দ-বেদনার ভৈরবী বেহাগে। ভাবি, এখানে তো আত্মীয়দের বাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বেশ কেটে যাচ্ছে, ফ্রান্সে গিয়ে কি হবে? সেখানে কেউ পরিচিত নেই, ফরাসী ভাষা জানিনা। শুনেছি ওখানে শুধুমাত্র ইংরেজী সম্বল করে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। সে ভাবনা পরে আগে ত এদেশে আর যতটুকু পারি দেখেনিই।

ভাইঝি পম্পী নিয়ে গেল ষাট সত্তর মাইল দূরে সান্তাক্রুজ-বীচে পাহাড় পেরিয়ে। পাহাড়ী রাস্তায় এক একদিকে তিনটি বড় গাড়ী স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, চড়াই এত কম যে বোঝাই যায় না পাহাড়ে উঠছি বা নামছি। ছোট সমুদ্রতীরে নানারকম প্রমোদ আসরের ব্যবস্থা আছে। মহিলাদের স্বল্পাবাস ভারতীয় চোখে দৃষ্টিকটু হলেও এখানে তা মনে হল না। যে দেশ [redacted] যা। মনে পড়ে গেল বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। বোধহয় যৌবনের অলিখিত প্রতিযোগিতা হয় এখানে।

পরদিন আবার আটলাণ্টার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লাম। সেণ্ট লুই বিমান বন্দরে নেমে অন্য প্লেনে। এটল্যাণ্টা (Atlanta) এরোড্রোমে নেমে দেড় মাইল পথ গিয়ে ব্যাগেজ সংগ্রহ করে বেরিয়ে দেখি সুজন ও শ্রীমতী মণিকা (মিঃ

ও মিসেস খুড়তুতো ভাই ও তার বৌ) হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন শুধু বিশ্রাম। পরদিন ব্রেকফাস্ট সেরে Walt Desney-র Epcot Center এর পথে Orlando-র Dey's inn-এ আশ্রয় নিলাম রাত্রে প্রায় ছ'শো মাইল পেরিয়ে। Epcot Center বিশালজায়গা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত। এখানে ডিসনিল্যাণ্ডের মত বাচ্চাদের ও অথর্বদের বাহনের ব্যবস্থা আছে, আছে ব্যাঙ্ক, ক্যামেরা ও অন্যান্য মনোহারীর দোকান। সব রকমের পানাহারের সচ্ছল ব্যবস্থা। সামনেই বিরাট এলুমিনিয়াম বলয়। ভিতরে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী যন্ত্র। প্রায় এর মধ্যে সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ছবি দেখানোর ব্যবস্থা। অন্য মণ্ডপে পৃথিবীর গতি বিষয়ক ত্রি-স্তর (3-D) সমন্বিত চলচিত্র প্রদর্শনী। শূন্যে লঙ্কা ইত্যাদির চাষ ব্যবস্থা, সমুদ্র বিষয়ক প্রাণী-প্রদর্শনীটি আকর্ষনীয়। সর্ব্বশেষে রাত্রে চারিদিকে পৃথিবীর কতগুলি উল্লেখযোগ্য দেশের আলোকসজ্জিত মণ্ডপ, সুন্দর বাজনার সঙ্গে লেসার-রে ও বাজী ফোটানোর খেলা অবিভূত করে।

কিছুদিন পরে উইক এণ্ডে "চ্যাটানুগা"য় ভাইয়ের এক বন্ধুর নবনির্মিত বাড়ীতে গেলাম ভাইপো ফুচুর সঙ্গে গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রনে। সেখান থেকে নিকটবর্তী পাহাড়ের মধ্যে দু'মাইলের মত গিয়ে দেখলাম পাহাড়ের গুহার অভ্যন্তরের উপর থেকে নীচে ঝর্ণার রঙিন জল পড়ছে! এই ঝর্ণা Ruby false নামে বিখ্যাত। আবার নিউ জার্সিতে কয়েকদিন। সেখান থেকে নিউইয়র্ক গিয়ে দেখলাম ম্যানহাটনের গগনচুম্বী সব প্রাসাদ। এখানে পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বাড়িতে উঠলাম, তবে তিন ডলার খরচ করে। বাড়ীটির নাম World Trade Centre, ১০৭ তলার বাড়ী"। এখান থেকে গেলাম ইউনেস্কোর বাড়ী দেখতে সেখান থেকে একটু লঞ্চে গিয়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখলাম। আমেরিকার পালা মিটল। এরপর ফ্রান্স। হাতে মাত্র দুদিন সময় থাকায় বাস্তবে কেবল মাত্র প্যারিসই হবে, ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গা নয়। প্যারিস! বহুদিনের স্বপ্ন! মালপত্র নিয়ে রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নীল বিমানবন্দরে ফোন করে জানাল—অকস্মাৎ কর্ম বিরতিতে ফ্রান্সের কোন প্লেন আকাশে উড়বে না, পরের দিন যেতে পারি! কী আর করব। দুদিনের একটা দিন চলে গেল! সব আশা পূর্ণ হয় না। তবু ঠিক করলাম এক মিনিটের জন্যে হলেও একবার স্বপ্নের প্যারিসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নোব।

ফ্রান্সের দ্যগল বিমান বন্দরে নেমে ট্যাক্সিতে উঠলাম। ভাগ্যিস ফরাসী আর ইংরেজির বর্ণমালা এক তাই কাগজে হোটেলের নাম লিখে ট্যাক্সি

ড্রাইভারকে দেখাতে সে যথাস্থানে নিয়ে গেল। প্রায় ষাট মাইল দূরে হোটেল। কিছু খেয়ে আবার ট্যাক্সি নিলাম যতটুকু দেখা যায় অল্প সময়ে। দূর থেকে দেখলাম 'Eiffel Tour, Palais Bourben (National Assemble), Fontaine-des-Inneccents, Louver, Palais du-Lusembourg (Senate) ইত্যাদি। উচ্চারণ প্রমাদের ভয়ে বাংলায় লেখা থেকে বিরত রইলাম। রাত্রে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম।

আমার ভ্রমণ শেষ। এবার ঘরে ফেরা। ঘরে ফিরতেই হয়। তবু আরও যদি কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া যেত! এওত পাথেয়। তবে যা পেয়েছি তাই বা কম কি! তবু মন মানেনা। মনে হয় এত বড় পৃথিবীর, এত মানুষের কতটুকু দেখলাম! থাই এয়ারওয়েজের দিল্লীগামী বিমানে ওঠার সময় কাকে যেন বলে এলাম—আসব, আবার আসব।

পদ্যাংশ

একশ পঁচিশ বছরে

বৈশাখী সন্ধ্যায় চাঁদ
শহরের পথে রোশনাই
জন মধ্যে মৃত দৃষ্টি
পার্কে শূন্য ফ্রেম মেলে ধরি
রঙ কই ক্ষয়িষ্ণু ক্যানভাস

শান্ত নদীর দিকে
হেঁটে যেতে ধূলো মাখামাখি

তবু জানি
কবি এক ছবি আঁকে
ছবি আঁকে চোখের মনের
স্নিগ্ধ দীঘির পাশে
রঙ লাগে মরা ক্যানভাসে

ওখানে যাবই আমি
তারপর হেঁটে যাব
একশ হাজার লক্ষ অনন্ত-বছর।

—০—

কোথা গেল

রাজা নেই, আছে তার নীতি
কাজ নেই এ বিতর্কে

চতুর্দ্দিকে ছায়া ছায়া ঘর
কিন্তু কোথা গেল
সেই অভাবী সংসার
ভাঙ্গা কামিনীর বেড়া ধরে যেথা
দাঁড়াত শাড়ী পড়া গোলটিপ মুখ
কল্যাণী মূর্তিতে

নগ্ন হাতের বিস্তার আজ
মধ্যবিত্ত সংসারেব প্রতিকোণে
শিশুর বিশ্বপ্রেমের হাতছানিতে
সাড়া দিতে চায় মন

ব্যথা পাওয়া মনে
বাস্তবতা ঝাঁকি দেয়
জ্বলে ওঠে নির্মম আকাশ

শিল্পী

মেঘ জমছে আর জমছে
দুঃখ-হাসির রোশনাইয়ে
ও কুমোর, দাও না ঘুরিয়ে চাকা
শান্তি সাম্যের পথে
ভালোবাসায়, তুমি বলেছিলে আসবে
দূর করবে অন্ধকার !
হে শিল্পী, ভেতরে আঁকো
তবেই পারবে কথা বলাতে
কাগজ-তুলিকে

—০—

দিক নির্ণয়ে

মিলনের বাঁশি
সোনা হয়, অলঙ্কার হয়
বিরহের আগুনে
সে বাঁশি বাজে না,
বাজে নীরব সুরে
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক তার
মনকে শুনিয়ে যায়
জ্বল জ্বল করে জ্বল
ধ্রুব তারা
ভিখারী বর্দ্ধিষ্ণু রুটি খায়
দাঁড়িয়ে কুকুর।
পৃথিবী ঘুরছে
নিয়মের নৃত্যই বজায় থাকুক
পরীক্ষা চলছে

নিটোল চোখের জলে

পাথরে বাঁধানো ট্রামলাইনে
অসহ্য দুঃখের ধারাবাহিকতা
এখানে অগত্যা
হাড়-মাংস-চামড়ার মাঝে
চেষ্টা করি খুঁজতে অস্তিত্ব
মনের রঙ মাখিয়ে

সমুদ্রের বাস্তব ঢেউ
বারবার ভেঙ্গে দেয় সে স্বপ্নও
অবেলায় আকাশ ছেয়ে যায় অন্ধকারে
সন্ধ্যার অকাল প্রৌঢ়ত্বে
জাগতিক দায়-দায়িত্ব পথ আগলায়
নতুন করে তাজমহলের ইঁট গাঁথায়
মনের মধ্যে পাথরের ছুরি চালায় বেদনা

আবার এসো

বিদায়ের সুরে
বাঁশি বাজছে, মন কাঁপছে
নিজেকেই বলি আত্মকথা

মালা গাঁথা
পড়বে না তো ঝরে !
পুরোনো মন নিয়ে তাই
এসো হাঁটা যাক্
দেওয়া নেওয়া শুরু করি
বন্ধুত্ব-বিরুদ্ধতা নিয়ে
এসো, আবার এসো ।

—০—

হিমালয় কন্যা

হিমালয়ের গৌরীকন্যা
পাথুরে বুক থেকে
হাসি-খেলায় নেমে আসে
দেবভূমি গঙ্গোত্রী থেকে ঋষিকেশে

তারই অজানা বাঁকে
মেঠো পথ ধরে জল আনে
কর্কশ যৌবনা নারী
চোখে বাঁশির ইশারা
গাঙচিলের ঝটপটানিতে সে
সম্বিত ফিরে পেয়ে
জল নিয়ে চলে যায় ।

—০—

ঘুমভাঙা রাতে

ঘুম ভাঙা রাতে
আকাশে বিছানো থাকে
তারার বুনোট
অন্ধকার শাড়ীর মধ্যে
চাঁদের হাসি

মাঝে মাঝে রাত আসে
দু'জনে দূরে অথচ কাছে
আবার দূরেও
বাঁশি বাজে বিলম্বিত লয়ে
নীরব ছন্দে।

—০—

একটু শব্দের জন্য

অলস হয়েছে শব্দেরা
বেতের চেয়ারের ফাঁকে
রয়েছে ঘুমিয়ে নির্জনে
বিড়ালের মত।

রাতের ক্লান্ত শয্যায়
সে রয়েছে ঘুমিয়ে
দুঃখ না ভাঙার গোঙানি
মনকে কুরে কুরে খায়।

—০—

পাহারাওলা

পাহারাওলা নয়
নেই তার ইয়া ইয়া গোঁফ
ঘুর্ণায়মান চোখ, লাঠি,
প্রমাণ সাইজের জুলফি
আর রোমশ হাত

সে আমার মেয়ে
বয়স এগারো
ভাই তার শোয় তার কাছে
কিন্তু মাঝে মাঝে
কি-না-কি ভয়ে
শোয় সে আমার কাছে এসে
জিজ্ঞাসা করলে বলে :
বাবা, ভয় করছে
কি আশ্চর্য পাহারাওলার ভয়
সেতো কিছুতে হবার নয়

কিন্তু মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে
আমারো ভয় হয
ছোট বেলায় ফেলতুম কেঁদে
মায়ের আঁচল ধরে ।

—০—

তবু

প্রখর রৌদ্রে
জীবনের সব বীজধান
চৌচির হয়ে গেছে
যিশুর উত্তরাধিকার বুঝি
ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে
বিঁধে আছে শীতল ফুসফুসে

তবু, ভিতরে যেতে চাই
শৈশব শিশিরে যেথা হাঁস
আমলকি বনে গান শোনে
পরিচিত কোকিলের ঠোঁটে।

—০—

উড়ে চলে

মন আমার
উড়ে চলে পাখির ডানায়
শীতের মহাদেশে
শরীর শিউরে ওঠা শীতল বাতাসে

যায় সে গহন ব-দ্বীপে
অরণ্যে উঁকি মারে
নিবিড় যৌবনে

হঠাৎ চলে যায়
পেরিয়ে নীরব সাগর
সুবাসের কারুকার্য ভরা
এফিল টাওয়ারে।

—০—

বিকেল

অদূরে বাস স্টপ
আধময়লা শাড়ীতে একজন
দৃষ্টি থমকায়
স্মিত-করুণ মুখে
ছিন্নমূল ক্ষুধার জ্বালা।

নীড়ে ফেরা আকাশে
কৃষ্ণচূড়ার লাল হলুদে কোলাকুলি
হালকা মেঘের ওড়নায়
এলো মেলো

উদাসীন মনে ভাসে মেঘ
মেঘ, তুমি এখানেও দাঁড়িয়ে !

—০—

পুরস্কার

মধ্যাহ্ন সূর্য,
মেশে পাণ্ডুর আকাশে
তবু চলতে হবে
পাখির বাসা সাজাতে হবে
এক-একটা খড়কুটোয়

শান্ত সকাল আর
তাপদগ্ধ দ্বিপ্রহর সেরে
বেদনা সঞ্চিত মনে
অস্তগামী সূর্য তাই দেয়
অঞ্জলি ভরে পুরস্কার।

নিশ্চুপ

মুখে কথা নেই
অক্ষম প্রার্থনা

নিরুপায় নিরুপায়
মন কেঁপে ওঠে
ক্লান্ত ধুলো-কাদা দেহে
মেঘ জমছে
মেঘ কাটছে আলো-আঁধারে।

পার্থক্য

ঘুম দিচ্ছিলুম
এক তরুণী বলল, উঠুন
উঠতে দেরী করায় কে ?
বয়েস।

আরেকদিন
যাচ্ছিলুম উঠতে, অন্য মেয়ে বলল,
না, না, বয়স হয়েছে,
বসুন।

এই শেষ

ভিখারী ভিক্ষা চাইলো অপ্রসন্ন সুরে
প্রসন্ন বললো কাজ করবি ?
একজন বলেছিলো কোরবো
একদল মাছি এবং
নগদ একটাকা
এই শেষ।

কর্মহীন মানুষ

জন্মাওনি তুমি সুনির্দিষ্ট হয়ে
জন্ম আকস্মিক
জন্মালে ঝড়ে জলে
কর্মে, দুঃখে।

স্তিমিত গৃহকোণে
পারোনি আদায় করতে প্রাপ্য প্রদীপ
অবজ্ঞার নীরব দেয়াল
ভাই-বোনের মতো শূন্য এবং সুখ।

—০—

জীবন নিয়ে

পিচ্ছিল পথে
অন্ধকারে কালো ছবি হয়ে
স্তব্ধ জীবন

নানা রঙে যৌবনে এসে
মন ভাসে একা দ্বীপ হয়ে

সৌভাগ্যবানেরা সোনার ঝাঁটা দিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে অস্থিরতা
অন্যেরা বঞ্চনার কানাগলিতে
ব্যস্ত জীবন জুয়ায় আর নীতির ঝগড়ায়।

আরও কিছু পরে
পরিত্যক্ত বেশ্যার মত
গঞ্জনার মধ্যে শোনে জীবনের গান

কিন্তুর ব্যাখ্যায় ব্যস্ত
ঐতিহাসিক মহাকাল।

—০—

আধুনিকা

শুকনো ওড়া চুলে
হারিয়ে দেওয়া বিদ্রোহিনী হাসি
ফুলধনু ভ্রূর তীক্ষ্ণ শরে
আমন্ত্রণ জানায় চোখের তারা
লজ্জা হঠাৎ আবির রঙে রেঙে
উপচে ছড়ায় মুচকি হাসির ধারা
থমকে দাঁড়ায় ঠোঁটের কিনারায়
কিসের আশায়, তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে
হারিয়ে যাওয়া পুরোনো সেই মদ
এর পরের কথা নাইবা বলি
প্রাণের ভয় আছে ভীষণ ভাবে
তবু তো যাই তোমার কাছে ফিরে
মনের মধ্যে ছবি, জ্যান্ত ছবি।

শুধু যাই ক্ষয়ে

দুঃখের বেহাগে
অসহায় কালো ভ্রমর কৃষ্ণ রঙ
যাবে কি সে সাগর সঙ্গমে

নিরুপায় ক্ষোভে ভাবি
মনের মধ্যে হবে কি অগ্ন্যুৎপাত
ধ্বংস হবে কি আজ সব ?
কিন্তু কিছুই হয় না
ঘড়ির মত চলে সব কিছু
মনে মনে যাই শুধু ক্ষয়ে।

—০—

দ্বীপ নেই

যখন ভূকম্পন হয়
পা' টলে, কখনো লোক পড়ে
ধূলো লাগে, কেউ ঝেড়ে ওঠে
পারে না কেউ
বসে থাকে ধূলোর সাগরে
এ সাগরে দ্বীপ নেই তবু!

—০—

প্রজন্ম

চোখে-মুখে চেনা যায়
কে স্বজাতীর
মাটি অথবা আকাশ।
পরিচয় সারা জীবনের
চায় পরিচয়
মহা-পরিচয়
মনে মনে ভাবি নৃজ্যদেহে
সরলরেখা এলো কোথা হতে।

—০—

বাঘ

এক যে ছিল বাঘ
সে করেছিল রাগ
ছোট্ট ছোট্ট দুষ্টু দুষ্টু
মিষ্টি মিষ্টি বাঘ

হাত পা তুলে ভাই
ছোঁড়া যে তার চাই
আদর যদি না করলে
শান্তি যে তার নাই।

—০—

নিরুত্তরের পর

নিরুত্তরের পর
যা থাকে তাও বুঝি থাকে না
শূন্য থেকে বলে কেউ
বেঁচে আছি, আর-কি
বাঁচা-না-বাঁচার মধ্যে
তৃষিত চাতক প্রাণে।

আয়নায়

চড়ুই আয়নায় মুখ দেখে ঠোকরায়
ঘোরে-ফেরে-ঠোকরায়
বিড়ম্বিত নিজেকে অথবা
হারানো কারোকে
আমরা দেখি, ভাবি—
কিন্তু না, নিজের নয়
ওটা বর্তমানের ছবি
কেমন করে বোঝাই
পাখিকে, নিজেকে
যে-ভাবে দেখতে চাই।

শিশুবর্ষে

ফুলের মত শিশুরা সব
রং বেরঙে খেলা করে
প্রজাপতির ডানায় ডানায়
উড়তে থাকে এ সংসারে।
ধুলোয় কাদায় গড়াগড়ি
বিশ্ব অন্নপূর্ণার কাছে
ফুল-শিশু মাগে ভিক্ষা
পুতুল নিয়ে খেলবে বলে।

প্রার্থনা

শীতের মিষ্টি চুমু নয়
অশ্রুত প্রার্থনা
ঝুল বারন্দার নিচে
রুটি দাও, দাও গরম রুটি
মধ্য রাত্রে দাবি করে
বিকৃত বসন্তে দাও
অন্য কোন উলঙ্গ শরীর
দিনে ক্ষুধা রাত্রে ক্ষুধা
ক্ষুধাই রাজত্ব করে
সভ্যতার কিয়দংশ জুড়ে।

—০—

কফিন

কবরখানার কফিনে
শব্দহীন হাড়গুলো
রয়েছে আলাদা
আবছা আলোয় মাখামাখি
জীবন-মৃত্যুর অলংকার
এখনো মেলেনি কোনখানে

সোনালী বৃত্তের সুতীক্ষ্ণ নির্যাসে
করমর্দনের উষ্ণতা রয়েছে প্রচ্ছন্ন মৃদু আলোয়
নভোচারী সজারু ক্ষেপনাস্ত্র

একই সঙ্গে চলে নীল লাল সবুজের রক্তিম নিমন্ত্রণ

—০—

তবু চায়না সে

যদি বল অক্ষম
তালিকায় ঢুকবে অনেকে
ঠিক ঠিক রাজা নয়
যাত্রায় বিড়ি খাওয়া রাজা
কল্পিত বাস্তব অভিনয়ে

তবু চায় না সে
জয়ী হোক অন্য কেউ
যা দু'একজন আছে
বিধ্বস্ত—বিবস।

—০—

দ্বন্দ

অনেক কাজ
নদীর ভিন্ন খাতে বৃষ্টি-বজ্রপাতে
অভাব গঞ্জনার মধ্যে
উগ্রতার আড়ালে উঁকিমারে কল্যাণীরূপ
সরে যায় উইংশের পাশে
ধরা পড়ার ভয়ে

শিল্পী নই
আকৃতি উঁকিমারে
ঠেলে দেয় শিল্প-আঙ্গিনায়
অস্থির মন প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে।

—০—

এড়িয়ে চললেও
রক্তাক্ত দেখেছিল একজনকে
রাস্তায় আছে নাড়ি-ভুঁড়ি
জল চাইছে, চারিদিকে অসহায় জনমণ্ডলী

আরেক বার দেখেছিল
টুকরো করে ছেঁড়া কাপড়ে
একটি মেয়ের অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি

এই সব দেখেও
শান্ত মনে চলতে হবে।
যেন হয়নি কিছু।

অপলক চোখে

কবি লেখে, আসে কবিতা
আসে নাও,
যখন আসে, পৃথিবী নিশ্চুপ হয়
গালে হাত দিয়ে

আকাশ দূরের দিকে
ওড়া বন্ধ করে চেয়ে থাকে
অপলক চোখে।

পুতুল বৌ

খোকার পাশে পুতুল-রাণী
বসে ছিলো আনমনে
খোকা হঠাৎ গলায় মালা
পরিয়ে দিলো সেইক্ষণে

বাজলো না শাঁখ সানাই সুরে
নাচলো নাকো হাতি
না-জ্বালিয়ে হাজার বাতি
চললো নিয়ে সাথি

বাড়ী ঢুকতে উলু দিয়ে মা
বরণ করলো বৌ
তাই দেখে ময়না সখি
বলল, ওগো মৌ

আলতা-পা দুধে দিয়ে
চরণ-চিহ্ন আঁকে
মেঝের পরে ছোট্ট খোকা
ফিক্ ফিকিয়ে হাসে
বেনারসী ছেড়ে বৌ
ঢাকাই শাড়ী পরে
হুমড়ি খেয়ে পাড়ার মেয়ে
জড়িয়ে ধরে তারে।

বাসা

পৃথিবীর সবুজের বুকে
বন-পাহাড় সমতল করে
স্থপতি গোলাপ আঁকে
ইট-কাঠ-পেরেকের
হয় নীল বাসা

শহরের উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটে
বাসা বাঁধে দামী মানুষ
সাদা-কালোর ঘোমটায়

কুঁড়ি হয়

লোক চায় ফুল হয়ে ফুটতে
ফোটাতে প্রজন্মের কত চেষ্টা
দুঃখ-কষ্টে
সম্পূর্ণ হলেও থাকে অসম্পূর্ণ
সম্পূর্ণ তিনি

তাঁর অহৈতুকী কৃপায়
দুঃখের আনন্দে যখন
কুঁড়ি হয় পরিবার
হাসিতে আকাশ ভরে
শরতের গাছ-গাছালিতে।

পরীক্ষক

বড় পরীক্ষক সময়
সমুদ্র-পাহাড়ের ঢেউ-স্তব্ধতায়
সব ঘড়ি বলে, আমি ঠিক
তবু সত্য হয় না
মানুষের কর্ম-জ্ঞানে
অহঙ্কার ধূলিসাৎ করে
আত্মগত তিনি।

দেখো নিজেকে

বিনিদ্র রাত্রি
ক্যালেণ্ডারের পাতায়
বসন্ত, শীত ও অন্যেরা
এখনো রয়েছে মোম গলতে

সৃষ্টি করছে
নক্ষত্র নক্ষত্র
অদূরে আর এক নক্ষত্র বলে
রচনা করো পুঞ্জাক্ষী জ্ঞান
দেখো নিজেকে।

হে রামকৃষ্ণ

হে রামকৃষ্ণ,
মনের প্রথম আলো তুমি,
তুমি রাম-কৃষ্ণ, হরিণেত্র নিবাসিনীতেও

তোমার উপদেশামৃত মনে পড়ে
চলার পথের মাঝে
ধ্রুব তারা হয়ে, দিক ভ্রান্তে

বারোর মাঝে এক'কে
টেনে নিয়ে তুমি
করলে বিশ্ব-খ্যাত
অজ্ঞাত রয়ে নিজে
মহাত্মায় প্রকৃষ্ট হয়ে

তুমি দীনতারণ তাই
দীনতারিণী তোমায় দিয়ে
অপামরকে দিলো সন্ধান
অমৃতের ।

স্বপ্ন

দিনগুলো বিক্রি করে
সাজিয়েছিলো বাসা
স্বপ্ন দেখা হয়নি শেষ
দূর সমুদ্রে যাওয়া নুলিয়ার মতো
ছেঁড়াপালে দিক ভ্রান্ত
সমুদ্র হাওয়ার খেলায়
ঝিনুক কুড়োনো এক ছেলে
মুক্তা স্বপ্ন দেখে মনে

নাবিকের মত ফেরার পথে
পাচ্ছিলো বাধা তবু,
মন মানে না বলতে দূর অস্ত,
শেষে কূলে ভিড়ে দেখে
সবুজের শেষ বালুচরে
পূর্ববৎ ঢেউ ছুটে আসে।

পান্থনিবাসে

মহাকালের পান্থনিবাস
সমুদ্রের ঢেউয়ে চলে
যুগান্তরে, অশান্ত-অবিশ্রান্ত

স্থায়ী কেউ নয়
বাসিন্দা/পর্যটক
ঢেউ হয়ে বয়ে যায়
জীবনের বন্ধুর পথে
মানুষ নৌকার মত খাগ্য নিয়ে
আসে আর যায়
সমুদ্রের পান্থ নিবাসে
মুখ পাল্টায় যেমন সূর্য কিরণে
নীল-সবুজ-ধূসরে

অপরিচিত কাক ডাকা ভোরে
পথিক ভিড় করে তীরে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে

ঘুম-জাগা-ঘুম-জাগা
তফাৎ নেই, যদি না বুঝে চলি
তাৎপর্য জীবনের—বাঁচার
নদীর ঢেউ, ঢেউয়ের নদী নয়

চলেছে প্রবাহ
একই সূর্য-চন্দ্র-তারা
মাটি-জল-ঘাস পৃথিবীময়
তবু হাইফেনের কাজ
করছে না। সমুদ্র, রক্ত এক হলেও
রঙ, অর্থ, ভাষা-তো আলাদা
বাধা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে।

সুখে-দুঃখে

উদার সমুদ্র বেলাভূমে
দেখেছিলাম সন্ধ্যায়
সমুদ্রের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস
মেশে শান্ত আকাশ সঙ্গমে

ঘনীভূত কোন মধুর স্মৃতি
গতানুগতিকতা নিয়ে করে খেলা
মনে ভেসে ওঠে এক সাধারণী মুখ
যার শ্যামল কোমনীয়তা
মনে আনে দীপালোকের
গহন আলোকাভিসার
অজান্তে চোখ ভরে ওঠে
নীল সমুদ্রের দু'ফোঁটা জলের
আনন্দে, গাঢ় সন্ধ্যায়
সুখে-দুঃখে।

তার কথা

একটি শালিখ
ঘাসের লেবু রং পাতায় পা দিয়ে
স্বপ্ন দেখে
ক্লান্ত ডানায় ভর দিয়ে কত ওড়া যায়
ভাবে সে বাসার কথা
শাবকের কিচির-মিচির
প্রিয় সম্ভাষণের মতো লেগে থাকে কানে

দুপুরের কাঁচা সোনা ক্রমে
ম্লান রোদ ছড়ায়
কৃষ্ণচূড়া রঙ্ ঢেলে দেয়
চেতনার ডগায়
তার কথা পড়ে মনে
ভুলে থাকা কোন অবসরে
বেদনা মথিত মুক্তার মত।

যা আছে থাক

ঢেউ আর ঢেউ শুধু
ভেঙে পড়ে বেলাভূমে
আবহমানের ঢেউ ভেঙ্গে-ভেঙ্গে হাসে

যেতে হবে
কিন্তু মনে হয়
কোথাও কি আছে ঠাঁই ?

থাকলে ভালো, না থাকলেও
অতৃপ্তি থাক
যা অহঙ্কারে
মরেও বেঁচে থাকে
দৈনন্দিন পাঁচালীতে।

বাসর প্রতিদিনের

রাত্রি যাবে দিন আসবে
তবু এ রাত্রি তার
ক্লান্তি-মাধুর্য নিয়ে
আসবে না আর

হে ভালবাসার রাত্রি
চলে যেয়ো না
এ বাসর সজ্জা যেন
হয় অন্তহীন

তোমার কল্পনার রূপ
আঁকা আছে মূর্ত্তিতে, ছবিতে
সে রক্তমাংসের চেয়ে
কম ঘনিষ্ঠ নয়
আত্মার আত্মীয়।

হঠাৎ

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল
নতুন দেশের
বৌ-কথা-কও ডাকে
ওঠোনা, ওঠোনা, ওঠোনা
রাত্রিকে, চাঁদের ভাষায়
বসন্তের ঈশারায়

জোৎস্নায় ভাসছে
বাগান, বাড়ী,
মাতাল হয়েছে রাত্রি, কোরেছেও
দেখিনি কিন্তু ভাবছি,
পূর্ণিমায় প্রিয়তমারাও,
তাজমহলের আশায়
অথবা প্রিয়রা, কে জানে ?

শেষ মুলধণ

সন্ধ্যা থামে
ক্লান্ত দেহে ঘুম,
ভাঙ্গে সুখে-দুখেঃ

এরই মধ্যে পাল্টে গেছে
খসেছে একদিন
উদ্দেশ্য তারার দিকে
উদ্দেশ্য-বিহীন

মায়ার বেদনায় দাগ পড়ে
তবু চলতে হবে, হবে ছুটতে
নইলে

উল্কা গতিতে চলে, হায়
জীবনের শেষ মূলধন।

চাঁদনী

রাত্রের কুয়াশা মিশে চাঁদের আলোয়
স্তব্ধতাকে করেছে সোনালী
ঘুম নেই, সঙ্গিনী নেই
শীত-ঠোঁটে তৃষ্ণা
আলো অন্ধকারে দরজা খুলে
প্রাঙ্গনে তুষার জমে আছে
পাইনে-মাটিতে
ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ
মাঝে মাঝে থেমে শুরু হয়

জোব্বা-টুপি
অস্পষ্ট মূর্ত্তি দূরে
ধীরে, নিস্তব্ধ চরণে
এক রাশ ঠাণ্ডা হাওয়া
বয়ে গেল শিরশিরিয়ে
আসতে চাইলো আগুন
আলোয় দেখলো,
বরফ-হাসিতে মোহিনী।

প্রকৃতি

বলি লেখ, লেখেনা
আনমনে বসে থাকে
বলে, কি হবে
বুড়ি ঝগড়া করে,
কি হবে কিরে, খেয়ে কাজ নেই
হিসেব, হিসেব, হিসেব !
কম্পিউটার চিনিস, মন চিনিস না !

বটগাছের ঝুরির-প্রায় মুখে তার
শ্যামল ভালবাসার হাসি।

বসন্ত

শীত চলে গেছে
ভোরের পাখির কুহুতান
বলছে যেওনা, যেওনা
এখনো রাত বাকি

"তমিস্রা কেটেও কাটছে-না
ফুলের সঙ্গে আলো
ফুটছে, ফুটছে, ফুটছে
নতুন পাতা হাসি নিয়ে,
তুমি এসো, এসো

গহনের ভেতরে হাত বাড়ায়,
শীত শীত রোমাঞ্চ
নাতিশীতোষ্ণ কামনা
বলে, তুমি আসবে না
আসবেনা কোন দিন মিথ্যা করেও।

ঊষার আলোয়

নিস্তব্ধতায় যেতে হবে
দুরাতিক্রম্য দুর্গম গহনে
ভেতরে, আরো ভেতরে
ঘন অন্ধকারময় আলোয়
কালোর আলোয়, কালীরও
মহামায়া চায়না আসতে
ভোলায় ভাবনা দিয়ে
এ কোন সহকারী
বেদনাযুক্ত অপারেশন করে
অদ্বিতীয়ার হাসি নিয়ে

ঊষার গোধূলি আলোয়
শিব-শক্তি দেখে
স্নেহ-জননী পৃথিবী
আধ ফোটা আলোয়
সকরুন আশীষে

মন হাত বাড়ায়
পালিয়ে যায়, দু'ওবলে !

চিত্রার্পিত

আলো-কালোর মায়ায়
উঁকি মারে উষা-জাফরী দিয়ে
বটের খসখসে আওয়াজ আঙ্গিনায়
সন্ধিক্ষনে মন ছবি তোলে

চিত্রার্পিত দিন যায়
মেঘ দিগাঙ্গনে
বলাকা চমকে ওঠে।

ব্রাহ্ম-কমলে

আলো-ফোটা ব্রাহ্ম মুহূর্তে
ঠিকানাবিহীন বক
সন্ন্যাসী গেরুয়ায় চলছে
চির-সুন্দরে।

দিনে হারানো পাখি
ডেকে ওঠে
গ্রামচ্ছাদনের ক্ষর-রৌদ্রে
করুন মূর্চ্ছণায়।

তবু এ সময় আত্ম-স্বরূপ
ছড়িয়ে পড়তে চায়
ব্রহ্ম-কমলে
আলোর কাকলীতে, নিরবে।

বৌ-কথা কও

ভোর-সকালে
পৃথিবীর পরিব্রাজক মেশে
বিশ্ব-আলোক-ঝর্ণায়
নির্নিমেষে

মন বলে, এসো
বৌ-কথা-কও
প্রাণের কথা, মনের কথা
তিনি বলেন, গোপবধূ
কথা কও, বৌ-কথা কও।

মাধুরী

সূর্য্য-মাধুরী
নিলাভ হয়েছে
নতুন আলোয়

ছড়ানো-মুখ-প্রিয়া
মেঘের লালিমায়
নেপথ্য সঙ্গীতে

বিশ্ব-হৃদয়-আকাশ
কুমারীকে বলছে
মিলবো বর্ষায়

———————

বাঁশি

প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায়
উষার সন্ধিক্ষনে
অচেনা কালো থেকে
আসি চেনায়, আলোয়
না, এটাও চেনা নয়
মনে হয় !

এই সময় আমায়
ভালবেসেছে বা বেসেছি
তা'হলে আগেতো
না, হোতনা এরকম
আবছা নীলচে-শাদায়
শ্যাম-শ্যামা রঙ টানতো না

রাত্রি-দিন আসে যায়
এ সময়, বাবা বলতেন,
স্মরণ করবি তাঁকে
একমনে, কিন্তু মন যে
বটের মত বহুধা
সুরে সুর মেলেনা

ডাকছে পাখিরা, কাকও
পরে চেঁচাবে সাইরেন
যান্ত্রিক ঘোষনায়
রুক্ষ মুথ নীলের
ঢাকবে ভূষোয়
আসবে কেজো দিন
কাজ, কারজন্য, কেন ?

বীরত্ব নিয়ে কাজ করি
ভাবখানা এরকম যে
উদ্ধার কোরলাম সংসার
আগে অন্যরকম, এখন
মনে হয় যাত্রাই, নয় জীবন-নাটক !

যাত্রা, জীবন-যাত্রা !
কেউ রাজা-রাণী নয়
হাসছে আসল রাজা
মন্দিরে, ক্যালেণ্ডারে
রামায়ণ-মহাভারতেও
অথঃ কিম্ !

ঘুম আসেনা
ভাবিয়ে চলে যায়
আসুক কেউ-না-কেউ
উনি বা দেবী
তবে মুশকিল
চিনিনা কারোকে

দূরে আমার মত বয়
শীর্ণ নদী
ডাকবো ?   নাঃ থাক !
একলাই যাই
যেতে হবে যখন
যাচ্ছি, না যেতে চাইছি

মাঝিরে অকূল গাঙের
গোধূলি বেলায়
বাজে দিক ভোলানো বাঁশি
তার তো শুনলাম না
যদি আসে, শুনি
সজলে—

ওঁ-জবাকুসুম-সংকাশং

কুন্দ শুভ্র ঢেউগুলি
হাসির কুসুম রাশি
উপহার দেয়,
প্রতীক্ষা করে সূর্যোদয়ের
মেঘরাশি সরিয়ে
কখন উঠবে সূর্য্য
মন মৃদু স্বরে স্তব করে
ওঁ জবাকুসুম সংকাশং।

এসো বলি

ঘরের মধ্যে ঘর
ভেসে যেতে চায়
সমুদ্রের ডাকে
দূরের নৌকোগুলো
রঙীন পুতুলের মত ডাকে
স্নিগ্ধ নীরবতায়
এসো, কাছে এসো
আরো কাছে
দুটো মনের কথা বলি।

একা

একা বাঁশি বাজে
স্নিগ্ধ বেদন সরসীতে
ঘুম ভাঙ্গা রাতে
মনের আগুনে মনসিজে

ঢেউ শান্ত হবে
ভুলবে নদী স্রোত
স্থির চোখে
রইবে আনমনে

স্তিমিত-তীর মনে
একা বাজে, মন মাঝে ॥

এক একটা দিন

এক একটা দিন
পাখি গান গায়
তার সুরে, অকারণে

মন শুধু চায়
ক্ষণে ক্ষণে, জল-রেখা
দু'নয়নে, আনমনে

এক একটা দিন
পাখি গায় গান
সেই সুরে, এ মনে ।

সেদিন

সেদিন পর্ব্বতের স্তব্ধতা আনতো
শিব-সুন্দরের ছায়া,
আজ মৃত্যুর।
পরে হয়তো অমৃতের
ঘণ্টা বাজছে, বাজছে, বাজছে
ঢং—ঢং—ঢং
বলছে ঝরা পাতার সঙ্গে
সময় হয়ে আসছে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা আমার
কখন হয়েছ রঙিন
রাগ-অনুরাগের ঝর্নায়
বসন্ত বেহাগে
তবু ভাবি কোথা যাও
নিস্তব্ধ নিবিড় গহনে।

বসন্ত-বেহাগে

অপরাহ্ণ ছায়ায়
ঘণ্টার বিষণ্ন ধ্বনি গীর্জ্জা-মন্দিরে,
নিগূঢ় বন্দরে
নুয়ে পড়া রৌদ্রের ছবি
পাতার সঙ্গে খসে যায়
বিগত-বসন্তে, শীতে
শিশুর মুখ দোলায়।

———

পদক্ষেপে

ধূসর প্রৌঢ় সন্ধ্যা
রক্তাম্র-হাসি নিয়ে
আছে নিশ্চুপ
দুঃখ মোমের মত
চাইছে মেশাতে মাটিতে
অন্তিমের অলক্ত রঞ্জিত পদক্ষেপে।

ঘুম ভাঙা জানালায়

ঘুম ভাঙা জানালায়
পরিচিত তারাগুলি, স্মৃতি-ঘেরা
স্বপ্নের মায়ায়, হাতছানি দেয়
যেতে হবে নতুন বাড়ীতে

বড় একা

মানুষ বড় একা
জটিল গ্রন্থীতে তার
দুর্যোগের চিহ্ন
যদিও সে আশ্রয় স্থল

বাসা বাঁধে পাখি
সুখে গান গায়
সে শোনে, পারেনা।

পথ চলতে

জানলায় একা
আসেওনি যাবেও না
সুদূর-চারিদিকের

রাস্তায়
স্পৃহ-নিস্পৃহ লোক
অনুসন্ধিৎসু-নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে

পথ চলতে দেহ-ছাই
অথবা কার্ব্বনটেষ্ট বলবে
কোন মহেঞ্জোদাড়োর !

বলে

জীবন বিচিত্রা
আঁকে-লেখে তুলি-কলম
ঢেউ ওঠে নদী সাগরে

কল্প-ভাবনা
অতীত ভবিষ্যতে ছোটে
বীক্ষন নিয়ে

চিত্রলেখা থেকে চিত্রলিপি
অনুসন্ধি পুরাতত্ত্ব
সে কথাই বলে।

জীবন যেমন

বাপ মার ভাবনা
তিলোত্তমা হয়ে
মেশে পুত্র কন্যায়
নদী সাগরে, পাহাড়, বনানীতে

সূর্য্যের অলক্ত রাগ
অস্ত যায় ক্লান্ত সন্ধ্যায়।

গল্প

"খানিকটা ঘাম আর"

আরো অনেক কিছু, যার যোগফল হয় শূন্য। ট্রেন থেকে নেমে বাইরে ডি-লুক্সে, বসলাম। বৃষ্টি পড়ছে, কাঁচ বন্ধ। ঘাম ঝরছে। তারপর 'দু'চোখের কোল ভেঙ্গে নামা সাময়িক ঘুম। তার মধ্যে জীবন নাটকের দৃশ্যান্তর। শৈশবের নিরুপায় কান্না, স্কুল-কলেজের পরীক্ষা। উত্তীর্ণ, বেকারত্ব ও উমেদারী। চাকুরীর নূতন সূর্য, পরে গড্ডালিকা শুরু।

ঝাঁকানিতে চোখ তুলে দেখি সামনের বৃদ্ধের ষাট বয়সী নিকেল ফ্রেমের চশমা নিরবে বলছে—কি দাদা এর মধ্যেই ক্লান্ত! বৃষ্টি কমেছে। কাঁচ তুলে দিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া ও ঢুলুনির শুরু। ব্রেক! চিন্তায় ছেদ। নামতে হবে। নামলাম, দু'পাশের চেনা মুখ বাড়ীর মিছিলের মধ্য হাঁটছি। কে নাম ধরে ডাকলো। মনীশ ডাকছে, বোকার মত হাসলাম উত্তরে।

মনীশ, "কি ভাবছিলি?"

বললাম, "কিছু না, এমনি।"

অফিসের দরজা এসে গেলো, ঢুকলাম। চারতলার পুরোনো ঘর, ঢকঢকে চেয়ার আর রং চটা স্বজাতীয় টেবিল। বসা, চা-খাওয়া, কাজ। টিফিনের আড্ডা, কাজ ও ছুটি।

হাঁটার পরে বাসে হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা ও হতে পারত। এক বৃদ্ধ ছাতা ব্যাগ সহ দুমড়ে পড়ে আছে, চোখ নিথর। মুখের কাছে রক্তের দাগ। ভীড়, একই নাটকের পুনরাবৃত্তি। একটু ঘাম আর, আরো অনেক কিছু।

এইখানেই থামা উচিত ছিল কিন্তু থামলো না। জানালার কাছে বসলাম ট্রেনে। উল্টো দিকে বসা সুন্দরী বিবাহিতা মেয়ে। সিঁদুরের রেখা ধরে মনে পড়লো আরেকজনের কথা। সে এসেছিলো জীবনে। পাড়ারই, বলেছিলো, "তোমায় ছাড়া বাঁচবো না।" বাবাদের মত ছিল না। চোখের জলের মিনতি অগ্রাহ্য করতে হোল সজল চক্ষে, কপালে ঘাম, শুষ্ক তালু। কেশে গলা সাফ করতে চমকে উঠলাম। সামনেই নামতে হবে।

রঙ

হোক ছোট বাড়ী, নিজের তো! বালি ওঠা দেওয়াল, ঘরে ড্যাম্প, ছাদ থেকে জল পড়ায় শিলিঙে ছোপ ছাপ দাগ, কার্নিশে মাঝে মাঝে বট

গাছের দৃশ্য—একটা অনাকঙ্খিত আর্টের সৃষ্টি করেছে। আশে পাশের রঙ করা আধুনিক বাড়ী দেখে খারাপ লাগে, ঈর্ষাও হয়। মনে হয় ওরা বলে, 'ও বুড়ো, অনেকতো হোল, আর কেন!' নিজের বয়সের কথা চিন্তা করে আরো খারাপ লাগে। সবারই তো ব্যবসা করা/উপরী আয়ের টাকা নয়। নতুন হালফ্যাশানী ফ্ল্যাট বাড়ী গুলোতো গায়ে পড়ে শিষ দেয়! গা রি রি করে। ছাপোষা কেরাণী, নুন আনতে পানতা ফুরোয় তার আবার রাগ! ফুঃ—মনে মনে কে যেন রাগটা নিভিয়ে দেয়, মৃয়মান হয়ে যায় লেড়ীকুত্তার মত জলজলে চোখ নিয়ে। যদি একটা লটারী উঠতো! মনে মনে ফুঁসেও নিভতে দেরী হয় না, রুগ্ন ছোট মেয়েটার সরবতী লেবু কিনে আনতে পারেনি বলে।

ভগবান যাকে দেয় ছপ্পর ফুঁড়ে দেয়। দিন দু'য়েক পরে স্ত্রী বনানী কি-না-কি খুঁজতে গিয়ে—পুরোনো লাইফ ইন্সিওরের পলিশি পেল। ইন্সিওর অফিসে দরখাস্ত করে দিন দশেক পরে একটা চেক পেল শ্যামল। চোদ্দশ আঠান্নো টাকার চেক। ক্ষয়িষ্ণু ব্যাঙ্কে চেক জমা দিয়ে শ্যামল হিসাবে বোসলো। বনানীকে বললো, প্রথমে তোমার বন্ধক দেওয়া দুলটা ছাড়াব পাঁচশ টাকা দিয়ে। তারপর বাড়ীর সামনের দিক ও ঘর রং করে পাশ ও পেছনটা মেরামত করতে হবে ছাদ সহ। শীর্ণ-তোবড়ানো মুখে অদ্ভুত একটা চাপা খুশীর হাসি খেলে গেল বনানীর। তার চিকিৎসার কথাটা বলতে গিয়েও শ্যামলের খুশী খুশী মুখটা দেখে থেমে গেল, পারলো না বলতে। আহা, হোক না কিছু খরচ, গেরস্তর মুখটা একটু ভাল লাগবে তো, ভাবলো বনানী। তা ছাড়া ছেলের একটা ভবিষ্যত তো আছে? মিস্ত্রির পর মিস্ত্রি এলো, খরচের বহর শুনে হেসে চলে গেল। তবু শ্যামল দমেনি, অফিসের হারু বাবুর পটল-ড্যাঙা থেকে বুড়ো এক মিস্ত্রি আনলো। সে গেরস্তর আশা শুনে অনেক মাথা চুলকে বলল, "বাবু সামনে আর বাইরের ঘর রঙ হবে, ভিতর পিছন ও পাশ খড়া মেরে ছাদে সিমেন্ট গোবর দিতে আরো আটশ টাকা লাগবে।" "লাগুক", শ্যামল মরিয়া হয়ে বলল, "চোবের কাছ থেকে সুদে ধার করবে। তবু এ করাতে হবে, ছেলে ও পাঁচজনের কাছে প্রেষ্টিজ থাকে না আর।" মিস্ত্রি সামনেটা মেরামত-রঙ করে রঙ মিস্ত্রিকে দিয়ে কমদামী রঙ করাল জানালা-দরজায়। হঠাৎ বনানীর বুকের ব্যাথাটা বেড়ে হার্ট এটাক্ করলো। গেরস্তর বৌ-রোগা শরীরে বেশী দিন ভুগলো না, ভোগালও না। তিন দিনের দিনই,

শ্যামল চোখের জল সামলাতে পারে না, ভাল করে চিকিৎসাও করাতে পারলো না। ছেলেটা বি. কম, পাশ করেও চাকরী পেলোনা, নিজের আর দু'বছর আছে। বেশী বয়সে বিয়ে করার ফল। কি করে কি করবে শ্যামল, ভাবনায় অস্থির হোল। ভেতরটা আর রঙ করানো হোল না শ্যামলের।

উৎসব

উমেশ বাবুর বাড়ী অত্যন্ত সাধারণ ধরনের একটি মেয়ে কাজ করে, নাম স্বাতী। মাজা রঙ, না রোগা না মোটা, শুধু সম্বল উঠতি যৌবনের, বিপদও সেইখানে। রিকসাওয়ালারা দেখে, শিশ্ দেয়, একা পেলে খিস্তি ছুঁড়ে দেয়। সব মেয়ের মতই সে চায় প্রেমিক, অন্ততঃ পূজোর উৎসবের দিনে। হিন্দি সিনেমার চটুল গানের মত ঢলে পড়া কাজের মেয়েগুলো কালো রঙ পাউডারে বেগুনী করে, টকটকে লাল লিপষ্টিক মেখে, নীল লাল ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে একে ওকে দেখিয়ে হাত ধরে যায় ঢং করে। সেও উৎসবের দিনে ওরকম সেজে আসে উমেশবাবুর ছেলে অশোকের কাছে কিন্তু অশোক ফিরেও চায়না। সে ঘৃণা করে বিপরীত ধর্মী সাজকে। তার মতে সাধারণীর সাধারণ সাজ ভাল, হ্যাঁ, যার রঙ আছে, চটক আছে তাকে স্বাভাবিক রঙে (natural colour-এ) পেণ্ট করলে ভাল লাগে। উৎসবের দিনে অশোক যায় পাড়ার সবচেয়ে বড়লোক সুজাতার সঙ্গে, মেলা দেখে গাড়ী করে। তার পয়সাতেই বেশীর ভাগ দিন হোটেলে খায়, taxi চাপে।

স্বাতী তার বিপত্নীক বাবার সঙ্গে অশোকের ঘরের জানালার পাশের বস্তিটার প্রথম ঘরেই থাকে। ঘর ! ঘর না ছাই, মাথায় প্যাণ্টাইল, দেওয়াল মাটির, স্যাঁত-স্যাতে ঘর, আসবাবের মধ্যে উমেশবাবুদেরই দেওয়া শ্রাদ্ধে পাওয়া খাট, ভাগ্যি তার বাবা গরীব হলেও বামুন। বাবা মিলে কাজ করে নিজেরটা জুটিয়ে নেয়। স্বাতীর খরচ স্বাতীকেই খেটে আয় করতে হয়। উপরি পয়সা বাবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদেই উড়িয়ে দেয়। মদ খেয়ে স্বাতীর গাল ধরে আদর করে, সেটাই একমাত্র সান্ত্বনা স্বাতীর।

এবার পূজোর আগে অশোক পড়েছে জ্বরে ! সুজাতা বেরিয়েছে অসীমার দাদাকে নিয়ে। জানলা দিয়ে যাবার আগে অশোককে সে হেসে জিজ্ঞাসা

করে গেছে কুশল-সংবাদ। হাসিটা বিদ্রূপই মনে হোল অশোকের। পাশ ফিরে শুলো সে। অন্যদিন লক্ষ্যই করে না স্বাতীদের বাড়ীর দিকে, আজ দেখলো স্বাতী শুকনো মুখে দরজায় হাত রেখে দেখছে, সামনে বয়ে যাওয়া আনন্দ-স্রোত। অশোকের কেন যেন ইচ্ছে হোল বলতে, স্বাতী এসোনা গল্প করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংযত কোরলো অসাবধানী ইচ্ছেটাকে। হঠাৎ রাস্তায় একটা হৈচৈ লাগলো, একটা ইঁট লেগে, স্বাতীর কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। স্বাতী শাড়ীর আঁচল দিয়ে কাটাটা ধরে ঘরে ঢুকে বিছানায় ঝাঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কাটার জন্য নয়, বাবা বলেছিলো রাস্তার একটা ছোঁড়াও ধরতে পারলি না এত দিনে, সেই ভেবে।

শীকার

ইভার বাবা-মা ইংরেজ। বাবা চাকরী পেয়ে এসেছিলো কলকাতায় ১৯৬৯ সালে। পার্কলেনে দাসানির পার্টিতে আলাপ হয়েছিল লিডা সিমনসের সঙ্গে। লিডা'র বিয়ে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইভার কাকার সঙ্গে। কাকা যুদ্ধের পরে ফিরে গিয়েছিলো লণ্ডনে লিডাকে না নিয়ে। পরে লিডা ভালবেসে বিয়ে করেছিল খড়গপুরের স্টেনো মিঃ সিমন্সের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে বাবা মারা যায় ইভার, সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। ইভার মার দেশে নিজের বা স্বামীর দিকের ভার নেবার মত কোন আত্মীয় না থাকায় আশ্রয় নেয় লিডার কাছে খড়গপুরে। সিমন্সের অফিসেই চাকরী পায় মা। দু'বছর পর অফিসার লুইসের সঙ্গে মায়ের বিয়ে হওয়াতে ইভাকে টাইপ শিখেই চাকরী নিতে হয় আই. আই. টিতে। সুন্দরী মেয়ে ইভার রূপ ছিল অপূর্ব, যৌবনও। ইভার দিকে অনেকেরই নজর ছিল, নজর ছিল রেলের অফিসার স্মিথ, ওর অফিসার রাম চন্দ্র চৌধুরীর। দু'জনেই সুপুরুষ কিন্তু চৌধুরীর দাবী ছিল অগ্রগন্য। স্মিথ ওকে নিয়ে গিয়েছিল উটি, কাশ্মীরে চৌধুরী। কাশ্মীরেই ইভা বাধ্য হোল।

জীবন--যে-রকম

আজ ছুটি, বারাণ্ডায় রোদ পোয়াচ্ছে শশীবাবু। বয়স ছাপ্পানো, দু'বছর পরেই অখণ্ড অবসর! পেটের অসুখতো ছিল, বয়স হয়ে বাতে ধরেছে। ইদানিং গা ম্যাজ ম্যাজ করে, টিপে দেবার লোক মানে স্ত্রী-সুমতি নেই, স্বর্গ

গত হয়েছে। বাড়ীর ক্ষেন্তি—বুড়িকে ঠিকে থেকে বারোমাসের পর্য্যায়ে প্রমোশন দিতে হয়েছে, নইলে রাঁধবে, ঘর সামলাবে কে ?

সামনে রিক্সা করে পদী পিসি যাচ্ছে হাতে গঙ্গাজলের পাত্রটি হাতে ঝুলিয়ে, পাছে অপবিত্র হয়ে যায়। কাষ্ঠ-রসিক বিনয়বাবু বাড়ী ফিরছেন আসবাব-পত্রের কারখানা-কাম-দোকান বন্ধ করে। ঐ তো হরিপ্রসাদ যাচ্ছে, খাটো কাপড়কে তুলে আখের বোঝা নিয়ে, অনেকদিনই বিহার থেকে এসে কাছেই ঘর নিয়েছে।"

ঘড়ি দেখেন শশীবাবু, ছেলে সুবোধ এখনো ফেরেনি রবিবারের আড্ডা থেকে। ছেলে চান করলে তিনি করবেন, চান করলেই খিদে পায় শশী বাবুর। মেয়ে নন্দিনী বা নন্দু বড়। চাকুরি করে সরকারী অফিসে, ছেলে সুবোধের বি-কম ফাইনাল-ইয়ার।

নন্দিনী, "বাবা এবার ওঠো বারোটা বেজে গেছে।" শশীবাবু বলল, "একটু দাড়া মা, সুবোধ আসুক।"

নন্দিনী বলল, "বাবা ছেলেক একটু বোকে দিও, বড্ড বেড়ে যাচ্ছে, সাড়ে-বারোটা-একটা-র আগে ফেরার নাম নেই বাবুর।"

শশীবাবু বলল, "বলেছি, কিন্তু শুনছে কে ?"

নন্দিনী বলল, "তা'হলে আমরা আগেই খেয়ে নেব, কেমন ?"

শশীবাবু বলল, "এবার থেকে তাই করবো।" নন্দিনী চলে যায়। শশীবাবু ভাবতে বসেন, সেই সেবার যখন ছেলে মেয়ে স্ত্রী নিয়ে বেনারস যান, হনুমানটা কি কাণ্ডই না করেছিলো, ধুতি-শাড়ী নিয়ে সামনের ডালে লাফ দিলো। অনেক করে কলা দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলাতে ফেরৎ দেয়। বাবা, সে দেখে নন্দিনী-সুবোধের কি হাসি আর লাফানি। সুমতিও হাসছিলো, হাসতে গিয়ে শশীবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন স্ত্রীর কথা মনে পড়াতে। বেতো পায়ের দিকে তাকান শশীবাবু, এ পায়ের যাত্রা টলোমলো ভাবে সুরু হয়ে ছিল, কত লাফা-লাফি, খেলা-ধূলো, ছুটে বাস ধরা আর আজ, দোতলায় সিড়ি ভাঙ্গতেই কষ্ট হয়। ভাবেন, নন্দুর বিয়ে হয়ে গেলে সুবোধ এক ঘরে আর তিনি আরেক ঘরে।

ভাবনার দৃশ্যপট ঘুরে গেল ছেলেকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে, ব্যস্ত গলায় ডাকলেন, "নন্দু, সুবোধ এসেছে, স্নানের জোগাড় করে দে এবার।"

শশীবাবু খেয়েদেয়ে সিগারেট ধরিয়ে আবার বারাণ্ডায় বসলেন। নন্দু ঔষধ দিল, শরীরটা আজ ভাল নয়। সুবোধ আর নন্দু পাশের ডিভানটায় বসল।

সুবোধ বলল, "বাবা বেড়াতে যাব, এবার রাজস্থানে বন্ধুদের সঙ্গে।" এখন সে আর ছোট নেই, বাবার সঙ্গে যাবে। নন্দু অবশ্য গত বছরে বাবার সঙ্গেই গিয়ে ছিল হরিদ্বার, একটা ভারি কম্বল কিনেছিল সেবার—মা তো নেই, বুড়ো বয়সে শীতে বাবার কষ্ট হবে তাই। নন্দু বলল, "বাবা আমি টাকা জমাচ্ছি, তুমি রিটায়ার হলে মোটা টাকা পাবে, ভারতীর মুখে যা শুনেছি, ফরেনে যেতে খুব বেশী খরচ নয়। তোমাতে আমাতে যাব সুবোধকে কলা দেখিয়ে।" সুবোধ বলল, "যা যা, আমিও যাবো চাকুরীর দু'চার বছর পরে তোদের দেখিয়ে।"

শশী ভাবলো, ফরেনে নয়, সেও বাবাকে বলেছিলো, "ভারি তোমার হরিদ্বার-বেনারস যাওয়া, চাকরি পেয়ে আমি ও যাব বোম্বে, গোয়া, ব্যাঙ্গালোর, চক্রবৎ!

অভিমন্যু

সকাল—সন্ধ্যার চেহারায় মৃদু আলোর মিল থাকলেও পরিণতি বিপরীত—কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা, আর ঝরে পড়ার মত। দ্বিতীয় শৈশবে আসে শেষ ইচ্ছা পূরণের তাগাদা আর অনুরূপ আলোর মোহ, পৃথিবীর সব কিছু মুছে যাবার সময় থাকে আমি, আমি, আর চিরকালের তুমি!

প্রৌঢ় অনিব্রত গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখে চাঁদ-তারারা সুপরিচিত ছন্দে। গৃহিণীকে জাগানো বিপদ, ওর বাতের ব্যথা বেড়েছে, মন বিবেকের দ্বন্দ্বে। চন্দ্রালোকে একা খারাপ লাগে। দোসর না থাকার মত থাকলে, না থাকলে ততোধিক। যদিও ডাক্তারের বারন তবু, একটু জল খেয়ে সিগারেট ধরায় অনিব্রত—ধূম্রজাল চাঁদিনীকে আরো মায়াবী করে তোলে, অস্বাচ্ছন্দ্য ভিন্নখাতে বহাতে ডায়েরীর আশ্রয় নেয় অনি, জীবনের চলচিত্র এলবামেরও।

সমুদ্রের স্পর্শ মৃদু বাতাস, বেশী হলে ভাসবে। মন সাবধানী হলেও কখনো কেন প্রগলভ হয় অনি বোঝে না, স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক? ব্যতিক্রম তার মনে নয়, অতিশয্যের পার্থক্য হতে পারে ভিন্ন জনে!

বোধহীনতা থেকে বোধে আসতে তখন (পঞ্চাশ বছর আগে) সময় লেগেছিলো সাত, এখন লাগে আড়াই বছর। তবে অবোধতা কাটলেও সুবোধ হতে লেগেছিলো তেইশ। যৌবন ছিল আতিশয্যময়, এখন সে দুর্ব্বোদ্ধতার আড়ালে করে নগ্ন হাতের বিস্তার। বয়স একই ছন্দে চললেও রূপ পরিবর্তন

ইঙ্গিত দেয় যুগ-মানস পরিবর্তনের। নাতি-কঠিন ভাবে অনির কুঁড়ি বিকশিত হতে সুরু করে ছিলো, আধো-আধো থেকে তেইশে পৌছতে, ফুটতে লেগেছিলো রৌদ্র-বেকারীর জ্বালা।

ঘূর্ণির শেষ নেই—একের পর এক আসে শেষ অবধি। সবাই জীবিকার সন্ধানে, বাঁচছে বাঁচার জন্য, মরতে ভয় পায়। তাৎপর্য্য জানে ক'জন!

চাকুরীর চেষ্টায় অনিব্রত ঘুরছে, ঘুরছে দিন-সপ্তাহ-মাসের পর মাস। অনিব্রত গেছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে। মোহময়ী অফিসবাড়ীর জানালা নায়িকার মত ডাকছে, এসো, কাছে এসো। হ্যালুশিনেসান্! চাকুরী তাকে পেতেই হবে, অবশ্যকেও। অল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে, রুগ্ন ব্যাগের কথা ভেবে সে রাস্তার কলের জলে পিপাসা মেটায়।

বিরাট লাইন! ভুলেই গিয়েছিল আজ শেষ দিন, কার্ড-রিনিউ করতেই হবে। রোদ্দুরে ঘাম চলকে পড়ছে। চল্লিশ মিনিট গেলেও আরো লাগবে আধ ঘণ্টা। পিছনের সতীর্থের ফ্লাস্ক থেকে জল খেয়ে শেষ দুটো চারমিনারের একটা তাকে অফার করে নিজে ধরালো, কড়া ধোঁয়া জীবনের মত। রিনিউ করে ঘুরতেই পৃথিবী টললো, বসে পড়ল সিড়ির ধাপে। সতীর্থ বা সুবীর তার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে বলল, একটু জল খান। চলুন, ওই চায়ের দোকানে যাই। অনিব্রতর বিব্রত মুখ আমতা আমতা করাতে বাধা দিয়ে বলল, চলুনতো, পরের বার না হয় আপনি দেবেন। চায়ের সঙ্গে বিস্কুটও বলল, আঃ রাজ ভোগ! এরপর থেকেই সুবীরের সঙ্গে আলাপ, ক্রমশ সে কাছে এলো অন্যান্যদের চেয়ে, পরিচয়ের কচিপাতায় গাঢ় রঙ লাগলো। দু'জনেই কাগজ দেখে এ্যাপ্লিকেশন ছাড়ছে, ইণ্টারভিউ দিচ্ছে। এছাড়া অনিব্রত পরিচিতদের অফিসে যাচ্ছে চাকুরীর খোঁজে। এইমাত্র খেয়ে এসেছে বলে জল খেয়ে অপরকে খাওয়াচ্ছে। কলেজের প্যাণ্ট শার্টগুলো ছিঁড়ে আসছে, ওগুলো এখনকার টেরেলিনের মত অমর নয়, জিন-পপলীনের!

কয়েক মাস আগে একটা ইণ্টারভিউ দিয়েছিলো, সেখান থেকে চিঠি এলো নিয়োগের বছর ঘুরতে। চাকুরী, নূতন সূর্য্য! বাড়ী থেকে বরাদ্দ হোল ট্রেন মান্থলী আর দিনে দেড় টাকা। শেষের ক'দিন বরাদ্দ কমল, এক টাকা, হাত খরচ অচল হতেই এলো নতুন মাসের প্রথম দিন। হাতে এলো নগদ একশো একত্রিশ টাকা, রাজা! হ্যাঁ, ত্রিশ বছর আগে সেই ছিল করনিকদের সম্মানমূল্য। এখন থেকে অনিব্রতকে বাড়ীতে দিতে হবে পঞ্চাশ করে মাস-মাস।...

দুই বন্ধুর ভিন্ন অফিস হওয়াতে দেখা হোত চৌরঙ্গীতে শনিবার হাফ-ডে করে দূরভাষে আলাপের পরে। অধরাও আসতো মাঝে মাঝে। নীল আকাশের মেঘেরা পাল তুলে চলত হাওয়ার টানে। নানা রং বেরঙের জামা-কাপড়, খাওয়া, রঙ্গ রসিকতা চলত। এমনি চললেই ভাল হোত, চললো না। বাড়ীর চাপে অধরাকে ধরা দিতে হোল অন্যের হাতে। মনে এলো বিরহের-বসন্ত, জ্বরতপ্ত আগুনের তাপ চারদিকে, কিছু ভাল লাগে না! সুধীর বলল, অনি, চল পুরীতে। অনিরুত বলল, যাবোতো কিন্তু জানতো আমাদের অবস্থা, টাকা পাব কোথায়? সুধীর বললো, আমি দাদার কাছ থেকে ব্যবস্থা করবো, তুমি দিয়ে দিও মাস-মাস। পুরী এক্সপ্রেসে আধো ঘুমে রাত্রি কাটিয়ে ওরা নামলো বালি-মাটির-দেশ পুরীতে। প্রথমে বুঝলো না অনি সমুদ্রের ঢেউগুলো হেসে ব্যঙ্গ করছে, না কাছে ডাকছে! স্বর্গদ্বারে ঘর নিলো দুজনে। ঢেউ আর হাওয়া, হাওয়া আর ঢেউয়ের মেঘের রঙে-রঙ পাল্টে খেলা আর খেলা! কিছু পরেই সুনীল মেঘের অভ্যর্থনা, এসো, কাছে এসো, ঢেউদেরও!

বালির ঘর করা আর ভাঙা দেখে সে বুঝলো—মন ধীরে ধীরে শান্ত হোল। ওখানে আলাপ হোল এক পরিবারেরসঙ্গে, দেখে-বেড়ানোর-বাসে। বিমলবাবুর ছেলে সমীর তাদেরই সমবয়সী, তার সঙ্গে ভাব সহজে জমে গেল, মেয়ে অলকার সঙ্গেও। ভদ্রলোক বিপত্নীক। পঞ্চাশোর্দ্ধ বিমলবাবু প্রায়ই মন্দিরে যেতেন বা সমুদ্রের ধারে একজায়গায় বসে থাকতেন, ওরা চারজন মুড়ি বাদাম বা চা সিগারেট নিয়ে দূরে দূরে গল্প করতো, বেড়াতো। কয়েকদিন পরে ফেরার দিন ঠিকানা বিনিময় করে অনিরা ফিরলো আগে। মনের মেঘ সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিয়ে অনিরা ফিরলো।

আবার অফিস, শনিবারের সিনেমা বা আড্ডা, ছোট করে এদিক ওদিক বেড়ানো, হাল্কা মেঘের মেলায় কাটতে লাগলো দিন-মাস-বছর। অলকাদের বাড়ী যাওয়া আসায়, ভাব-ভালোবাসা এ যাত্রায় শেষ হলো দু বছর পরে বিয়ের পিঁড়িতে। ছাঁদনাতলায় আবার দেখা দুজনে, ভালবাসার দৃষ্টি হোল দায়িত্বের। সুধীরের বিয়েরও চেষ্টা করছিলেন ওর বাবা-মা, ওর বিয়ে হোল অনুরাধার সঙ্গে মাস দু'য়েক পরে। দুই বন্ধুর পূর্বশর্ত মত এর দিন পনেরো পরে ওরা গেল পুরী, এবার জোড় বেধে। সমুদ্রের সফেন হাসিতে এবার নিলীমা উচ্ছ্বলে পড়ছে, ভালোবাসার ছন্দে পৃথিবীর সবকিছু দুলছে।

কোনারকের মূর্তি এবার প্রেম রূপ নিল যুগলবন্দীতে। আগের সেই

বালুচরের উদাসীন সন্ন্যাসী ভাব আর নেই, সে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-মালা এবারে রীতিমত উর্মীমুখর। জীবন-যুদ্ধের অতৃপ্তি শেষ হোল মধু চন্দ্রিমায়!

ফেরার পর জীবন শুরু হোল নতুন দিনপঞ্জিতে। বছর দুয়ের মাথায় সুবীরের পুত্র হোল, তার কয়েক মাস পরে অনির কন্যা। অনি ও অলকার বাবা-মা বলল, মেয়ে হল, তা' বেশ। হতাশার গন্ধ মেশানো মন্তব্য বলা বাহুল্য জোড়া কানে মধুবর্ষণ করলো না। এরপর দু'আড়াই বছর বেড়ানো বন্ধ, বাড়ী-অফিস-বেবীফুড নিয়ে গেল।

অনিব্রতর বাবা মারা গেলেন, আয় কমলো, ব্যয় কমাতে হল কৃচ্ছতায়। অনির পানামা নামলো চারমিনারে, বেশভূষাও। জীবন সংগ্রামের আসল চেহারার সম্মুখীন হোল অনি। কো-অপারেটিভ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, সব রকমের ধার চলতে শুরু হোল বাড়ী মেরামত বা অসুখের বা অন্যান্য খরচে, খরচ বাড়ছে, আয় সেভাবে নয়। পোনা মাছের স্থান নিল কুঁচো চিংড়ী, মৌরলা ইত্যাদি, তাও সপ্তাহে দু'তিন দিন। বাচ্চার দুধ যোগাতে বেড়ানো বন্ধই হয়ে গেল। শুধু সিনেমার জল-গোলা-দুধ রইল আনন্দলোকে। সুবীরদের অবস্থা ভালো, ওরা দু'-বছর অন্তর বেড়াতে যায়, অনিরা গল্প শোনে। চক্রব্যূহে অভিমন্যু, পারবে তো গণ্ডি পেরোতে?

দুজনেরই বাড়ীর লোকেরাই ছেলে হোল না বলছে। অনি ভাবে, সংসারই চলে না আবার ছেলে। একে মেয়ের বিয়ের চিন্তায় পনেরো হাজার ইন্সিওর করতে হয়েছে, আবার যদি মেয়ে হয়? অনি ভাবতে পারে না কি করে অন্যেরা বলে একথা। আগে দু'একটা টিউশনি করতো অনি, এখন করে ছয় সাতটা, অবসর গুলো বিক্রি করতে হয়েছে অনিকে। মেয়েও বড় হচ্ছে, তারও মাষ্টার রাখতে হয়েছে। এক রবিবার ছাড়া মেয়েকে নিয়ে বসতেই পারে না অনিব্রত। খাওয়ার অনিয়মে অনিব্রতর হোল গ্যাষ্ট্রিক, গিন্নির ব্লাডপ্রেসার, সুগারো আছে সঙ্গে। দু'জনের জন্যেই মাসকাবারী ঔষধ কিনতে হচ্ছে। এ চক্র চলছে, চলবে মধ্যবিত্ত পরিবারে।

রম্য রচনা

চেনা-অচেনা

সভ্যতার কৃতিত্বে দু'পেয়ে আজ চারপেয়ের চেয়ে বলশালী, পোষাকে-প্রসাধনে চেনা যায় না। ঠিকমত দেখলেও আয়নায় নিজেকে সঠিক চেনা যায় না।

আমরা লোক চিনি না, বললেই হোল? ঘরে, অফিসে, পাড়ায়, সবাইকেই চিনি। চিনি কিন্তু চিনি-না-ও। ল্যাজে পা পড়লে বা না পড়লেও, স্নেহ অতি বিষম বস্তু! কেউ কেউ বলে রমেশদা বা পপি বৌদি ভাল ছিল, কিন্তু এখন? ওরে বাব্বা!

লোক পাল্টেছে শহরে-গ্রামে অর্থাৎ বিশুদ্ধ দুধ দেয় জুতো মারলে নয়, চাঁদির জুতোয়, ব্যতিক্রম ঈশ্বর। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, ফিরে দাও সে অরণ্য—

"এবার আয়না দে মা, মুখ দেখি
নিজেকেই পারি না চিনতে
তোরে চিনতে পারব কি?
এবার আয়না দে মা, মুখ দেখি।"

বেড়ানো

"চল মন বেড়াতে যাবি, দক্ষিণেশ্বরে, কালীঘাটে।" না, সে এমনি বেড়াতে যাওয়া নয়, সংসার/অফিস একঘেয়ে লাগলে চল বেড়াতে। কবি / বৈজ্ঞানিক মন বেড়ায় অতীত, বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে, জানা থেকে অজানায়। চল মন বেড়াতে যাবি? কোথায়, কত দূরে নির্ভর করে পকেটের আয়তনের উপর। ছোট হলে পুরী, বেনারস, দেওঘর, বড় হলে কাশ্মীর, হরিদ্বার, বোম্বে, রাজস্থান, গোয়া বা ব্যাঙ্গালোর ও দক্ষিণ ভারত।

যাবেন বিলেত—প্যারী? ভয় পাবেন না, খরচ পনেরো থেকে উনিশ হাজার। আমেরিকা হলে আরো দশ/বারো হাজার। চাঁদে বা গ্রহান্তরে? এখন নয়, দু' হাজার শতকে যদি পৃথিবী থাকে। চরৈবেতি, চরৈবেতি। চল মন বেড়াতে যাবি?

আড়ি

শ্যামলী ভারি হিংসুটে। ও আমায় হিংসে করে, ওর মার কাছে গেলেই, বুড়ো বলে। শুধু চকোলেট-ক্রুরির কেক দিলে ইচ্ছে মত একগালে বা ছ'গালে চড়ুই পাখির মত চুমু-ঠুকরে চলে যায়, যেমন আজকালের ছেলেমেয়েরা প্রণাম করে। আমিও চুমু না দিলে আড়ি করে দিই। আড়ি, আড়ি, আড়ি! কাল যাব বাড়ি, পরশু যাব ঘর, সেই ঘর, যে ঘর মানুষ চায় আজীবন কিন্তু যেথানে সত্যি করে যাওয়া হয়ে ওঠে না! বয়স হয়ে এই গোলমালটাই হয়েছে, এক বলতে এক বলি, লিখি। তবে একেবারে উজানে বয়ে যাই না, ফিরে ফিরে আসি।

শ্যামলীটা ভারিই চালাক, পড়া না'হলে বলে, "পড়িয়ে দাও না", ছবি আঁকতে হলে বলে, "এঁকে দাও না" ; বেকায়দায় পড়লে গলা জড়িয়ে আদরও করে, যেমন মা রাগ করে পিটলে আর আমি বাঁচালে।

জীবন চলে যাচ্ছে। বসন্তের পাতা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত কাটিয়ে ঝরতে শুরু করছে। কিন্তু কি চেয়েছিলুম, কি পেলুম, কি পাইনি, বলো রাগ হবে না? মধ্যে মধ্যে ভাবি, সত্যি করে আড়ি করে দেব। আড়ি! আড়ি! আড়ি! যাও! আবার পরক্ষণেই সামলে নিই, ও মা, এটাতো ভাবিনি, যদি ও (জীবন) সত্যি সত্যি আড়ি করে দেয়? তাহলে, তা'হলে কি হবে?

ভালোবাসা/লাগা

সুমনের সঙ্গে লিলির বিয়ে হয়েছিল যোগাযোগে। বিয়ের আগে ছ'জনের ভালো লাগা বা ভালোবাসার লোকও হয়ত ছিল কিন্তু সেই রকমই সত্যি বিয়ের পর ছ'জন পরস্পরকে ভালোবেসেছিলো। যেমন স্বামী-স্ত্রীর প্রথম ভালবাসা হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যেমন নতুন দম্পতি হাত ধরে বেড়াবার মধ্যে ভালোবাসার বিজয় নিশান তুলে ধরতে চায়। দিন-মাস-বছরের স্রোত বয়ে যায় ছ'টি দেহ-মনের ওপরে! কতবছর পরে এই বাহু কিন্তু পরে তা গিয়ে দাঁড়ায় ভাললাগায় (অভ্যস্ত হওয়ায়)।

সাঙ্গীতিকী

প্রখ্যাত সেতারী বিলায়েত হোসেন খাঁ সাহেবের "দেশ" শুনেছি তিনবার কিন্তু সেবার ভারতীর রঙ্গমঞ্চে যা শুনেছি তা ভোলার নয়। জ্বরের ওপর ওঁর দেড় ঘণ্টার আলাপ ও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের গৎ একটা অপূর্ব মেজাজ এনে দিয়েছিল সেই সন্ধ্যার। তিনি ও মাঝে মাঝে হাত থামিয়ে বলেছিলেন, "আমার বাজাতে ভাল লাগছে যদিও আঙ্গুল কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, আপনারা দয়া করে শুনুন।" প্রিয় প্রিয়তমাকে দিচ্ছে সঙ্গীতাঞ্জলি, তাই এ আকুতি!

সিংহী পার্কে সেবার আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের বোধহয় প্রকাশ্যে সরোদের শেষ বাজনা শুনেছিলাম। তবলায় বেনারসের উদীয়মান তবলচী আল্লারাখাঁ। খাঁ সাহেব তু'বার বাজনা থামিয়ে তবলচীকে বলেছিলেন, বেটা জরা আহিসতা, মেরা উমর তো খেয়াল করো।" মাথা নাড়ালেও আল্লারাখাঁ রাখেনি সে অনুরোধ। সঙ্গত ছায়ার মত অনুসরণ করবে এই নিয়ম। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তখন ক্ষুব্ধ হয়ে সরোদের খোলে তবলা শুরু করলেন। চমক দেওয়ার নয়, সত্যিকারের যুদ্ধ! তুই বাদক উঠতে উঠতে চূড়ায় পৌছে আল্লারাখাঁর হাত আর চলল না। পঁয়ত্রিশ বছর তবলা সরিয়ে পঁচাশীর হাত ধরে বলল, মাফ্ কিজিয়ে গুরুজী। গুরুর আবার সেই একই কথা, "ময়নে পহেলেই তো বোলা থা, বেটা, মেরা উমরতো খেয়াল করো!" এসব বছর পচিশ আগের ঘটনা।

বোধহয় সেই বারেই শুনেছি মিয়া বিসমিল্লা খাঁর সানাই, ভোরে। অবসন্ন দেহ-মন, মনে হোল কোথায় যেন ছোট একটা মেয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে আকাশ ভরিয়ে দিচ্ছে ভৈরবী—প্রভাতে।

আয়না

মানুষের আত্ম-প্রেমের প্রথম প্রকাশ আয়নায়। ছোট মেয়েদের কেউ-না-কেউ ঘোমটা দিয়ে আয়না দেখে, হাসে।

আয়নার সামনে ছেলেদের চুল আঁচড়ানো / মেয়েদের পাউডার-লিপষ্টিক-টিপ পরা যৌবনে বেশ সময় নেয়। এমন কি সেণ্ট মাখা ও চুলে ফুল-মালা দেওয়াও।

এরাই কালক্রমে আবার পাকা চুল, শীর্ণ মুখ দেখে আয়নায়।

ঝর্ণা

মেয়ে নয়, ঝর্ণা, ঝির-ঝিরিয়ে এলো-মেলো পায়ে পাইনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, বলছে, "দূও! ধরতে পারে না"। বাধা পেয়ে আবারো কলস্বরে বলছে, দূও, ধরতে পারে না। ছোট মেয়েও এরকম খেলে, নাম স্মিতা।

কার

খাচ্ছিলো নুটুবাবু নিমন্ত্রণ হরিবাবুর বাড়ী বৌভাতে। হরিবাবু বেহাইকে বললেন, কেমন মাংস খাচ্ছেন? নুটুবাবু ভাবলেন, কার মাংস। তিনি ছা-পোষা হরিপদ কেরাণী, মেয়ে সুস্মিতার হাসি চলে গেছে রঙ-টাকার অপ্রতুলতায়। এরকম অবস্থায় পড়তে তিনি রাজি যদি কন্যাদায় উদ্ধার হয়।

দাও ফিরে

এটা টিভির যুগ, হুজুকেরও বলতে পারেন। এলো রেডিও, টি. ভি আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হোল সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর এই অগ্রগতির যুগে। এ যেন পরিবারের গাছের গোড়া কেটে বন মহোৎসরের সূচনা। মা, বোন, ভাই এমনকি স্বামী-স্ত্রীতে, ছেলে-মেয়েতে বিভেদের অগ্রগতির যুগ।

দাও ফিরে সে অরণ্য ও আরণ্যক সরলতা!

ব্যবধান

মথুরবাবু আর পারেন না! চাকুরী-সংসার-ধার। খরচ বেশী হলেই জরদ্গব অবস্থা। বিদেশী বা দেশী কাবুলির কাছে হাতপাতা। সুদ দেওয়া, আরো কঠোর জীবন। মাইনের চেয়ে বেশী বাড়ে দাম, বোঝার ওপর শাকের আঁটি নয়!

এমনি এক বেশী খরচে পড়ে মাসের শেষে মেয়ের বাড়ী গেলেন মথুর বাবু। বললেন তার অসুবিধার কথা। মেয়ে পারবে না বলাতেও বাজারের পথে মেয়ের সঙ্গে দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে তৃপ্ত হলেন মথুর বাবু।

অন্য কিছু উপায় না দেখে পরের মাসের প্রথমে আবার গেলেন মথুর বাবু। চা-এলো, এলো বিস্কুট কিন্তু এলো না প্রার্থিত। মুখটা তেঁতো মনে হোল।

আগের দিন

আর নেই। কালো-সোনালী চুলে বাতাসের ঢেউখেলানোর দিন। এসপ্ল্যানেডে বিকালে অফিস ছুটির পরে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, আড্ডা ও ঘোরা। দিনের পাতাঝরা সাজ ক্লান্ত তবু প্রৌঢ়ত্বকে সক্ষম রাখতে হবে! উপায় কি সেলুকাশ! সেদিন আর ফিরবে না, ফিরবে না অনেক কিছু। সূর্যোদয়ের দিন গেছে, আছে শুধু সূর্যাস্তের আলো। মন গোধূলি-পথে হাঁটছে এলোমেলো পায়ে।

বিদায়

অফিসের অনেকে বিদায় নিচ্ছেন। আজ ত্রিদিব বন্ধু ঘোষের বিদায় সম্বর্দ্ধনা। একসঙ্গে গল্প করেছি, চা-মুড়ি খেয়েছি। ত্রিদিবের গলা কেঁপে উঠলো কিছু বলতে গিয়ে। এর মধ্যে শুনছি আমাদের বিদায়ের পদধ্বনি। অসহায় একলা মনে হোল। শেষ যাওয়ার সুর শোনা গেল বিয়োগান্ত নাটকের চিত্রায়ণে।

শশ্মান

মৃতদেহ সুন্দর-অসুন্দর, ধনী দরিদ্র, নারী-পুরুষ, গঙ্গা বা অন্য কোন নদীর যে স্থানে চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় সে স্থান শশ্মান। ক্ষণিক উদাসীন মনে মনে হয়, মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। জলে স্মৃতির-ঢেউ ভাসে, দুঃখ কল্পনারও। কিন্তু নদী বয়ে যায় উদাসীন ভাটিয়ালীতে, কলস্বরের নৈশব্দে। জীবনের সুপ্রাচীন বট গাছ ঝুরির মধ্যে আনে নতুন জীবনের ইংগীত, শশ্মানও।

বিয়ে

অন্নপ্রাশনে শিশুর হয় প্রথম সামাজিক স্বীকৃতি, বিয়েতে বড়দের। বাবা বলতেন, দু'গাছের ছাল জোড়া লাগলে ভাল, নইলে?

সেই সময়ে পিসি, দাদা-দিদিদের বিয়ে দেখে এবং আত্মীয়দের বাড়ী বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে, মনের আবছা ধারনাটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। জ্বালাধরাটাও। মেয়েরাও আয়নার সামনে অলক্ষ্যে টিপ পরে, ঘোমটা দিয়ে বিয়ের রিহার্শাল দিয়ে নেয় মনে মনে।

বিয়ে মানেই সানাই / মাইক্রোফোন, আলো, ডেকরেশন, জেনারেটর, সেন্টের গন্ধ, আগোছালো রসিকতা, নানা ভাব-ভাবনা, সিল্কের পাঞ্জাবী, চুনোট করা ধুতি, ঘড়ি-আংটি-বোতাম, মালা, টোপর, শাঁখ, উলু, অভ্যর্থনা, বাসর সব মিলিয়ে মিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ।

যখন সেদিনটা আসে, অনভ্যাসে কাপড় সামলানো, ঘাম, সেন্ট, ও মালার গন্ধ, সুর, লজ্জা, মন্ত্র, আগুনের উত্তাপ, পিয়া-মুখ-চন্দা-মালাবদল-বাসর সব মিলিয়ে একাকার হয়ে মন রাজা-রাণী সাজে। যাদের হয়ে গেছে তারাও অনেকে।

রায়ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের যুগে ছিল পোষাক-গহনা-প্রসাধনের যুগ, এর কিছুদিন আগে দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো, খাবার দোকানের সামনে অনাহারে লোক মরে ছিলো কিন্তু লুট করেনি, কিছুটা ভয়ে কিন্তু তদানীন্তন মূল্যবোধেও। এই সময় থেকে মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন সুরু। এই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে বাপুজির অনুপ্রাণিত সত্যাগ্রহে বিনা প্রতিবাদে নির্য্যাতন সহ্য ও শহীদ -মৃত্যু আনলো তুমুল আন্দোলন। বাঁধলো ১৯৪৬ এ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, রায়ট !

চারিদিকে ধ্বনি উঠেছে আল্লাহো আকবর—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে ভাগরথী-তীর থেকে মৃতদেহের সংখ্যাতত্ব। সাইকেলে করে উপদ্রুত এলাকার খবর আসছে। বাড়ীতে যা কিছু অস্ত্রাদি ছিল তা নিয়ে যুবাকুল প্রস্তুত, মেয়েদের অন্দর মহলের বিশেষ দু'ঘরে রাখা হোল। দফায় দফায় চলল প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতির চিন্তা ও চেষ্টা। ছেলে মেয়েরা রইল মেয়েদের জিম্মায়, চাকর দরোয়ানেরা বাবুদের নিয়ে তৈরী রইল দরজায় পালা করে। সন্ধ্যার পর রক্তিম সূর্য্য ডুবলো না। আগুনের শিখায় সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এলো সবার মুখে। কখন এসে পড়ে। বাজার বন্ধ, খাদ্যদ্রব্য মজুত শেষ।

বড়দিদি ও বাবার কথা

দিদি পিঠে সুড়সুড়ি দিতে বলত, দিলে দু'চার আনা আদরেব বকশিস তখন তাতেই পেটভরা ঘুঘনি, আঃ !

কি-না কি অসুখ হয়েছিলো বড় দিদির। বড় সিরিঞ্জে ইনজেকসান দিত,

চিৎকারে কানে আঙ্গুল দিতাম পাশের ঘরে। চোখবুজে ভাবলে এখনো শিউরে উঠি।

কদিন পরে এক তান্ত্রিক বলে গেলো, এ রাতটা কাটলে হয়, কাটলো না। সকালে পাশের ঘরে বড় দিদি দেখি ফ্যাকাশে হয়ে মাটিতে শুয়ে, বেনারসী শাড়ী পরিয়ে একজন চন্দন এঁকে দিচ্ছে মুখে। জিজ্ঞাসা করলুম, বড় দিদি মাটিতে শুয়ে কেন? উত্তর পেয়েছিলাম, কান্নার।

বাবা বছর দুই গেছেন, বয়স হয়েছিল ছিয়াশী। সবাই বলল, বয়স হলে, সকলকেই যেতে হবে। শুনলাম, কিন্তু মন মানলো না। মনে পড়ে কার্শিয়াং-এ বাড়ী গিয়ে একদিন গোলাপ গাছের শুকনো পাতা ছিঁড়ছিলাম, বাবা বলল, "ছিড়চিস কেন?" বললাম, "নতুন পাতা গজাবে।" বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সকলকেই তো যেতে হবে একদিন, ছেড়েদে।' অপ্রস্তুত হয়ে ছেঁড়া বন্ধ করেছিলাম। কথাটা এখনও মধ্যে মধ্যে মনে ভাসে, আর ছিঁড়িসনি, একদিন তো যাবে সবাই ঝরে।

মেয়ে

প্রথমেই মেয়ে হোল, উভয় পিতৃ-মাতৃকুলে কেমন যেন উদাসীনতা, ছেলে নয় মেয়ে! অতৃপ্তি বোধ গৃহিনীকেও নিরুৎসাহ করেছে দেখে অন্নপ্রাসন একটু ভাল করেই দিলাম। সবাই বলল, এতেই এই, বিয়েতে কি-না কি হবে! ভাবলাম, শুধু ভাল বিয়ে হলেই বাঁচি। বেশ কিছু চেষ্টার পরে বিয়ের ঠিক হোল। ওরা বললেন ছ'মাস পরে বিয়ে। বললুম, আশীর্বাদটা হলে ভাল হয়, হোল। ছমাসে তন্ত্বের তিলোত্তমা সাজিয়ে বিয়ে দিলাম গলবস্ত্রে। জামাইয়ের অবস্থা ভাল, বংশও। প্রথমার কাজ শেষ এখন দ্বিতীয়ার খোঁজার পাঠ চলছে, দেখা যাক তাঁর ইচ্ছাতে কি হয়? তিনি ফুল ফুটিয়ে চলছেন, আমি মালাকর।

গল্পবলো

এ বায়না ছিল বাল্যে। পুরোনো ঝি খুকির মা ঘুমিয়েই পড়ত গল্প বলত বলতে, রাজা-রাণী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রাক্ষস খোক্কসের গল্প।

"এখন বলে ছোট নাতি," দাদু গল্প বলো! "যতবলি থলে খালি, শুনলে তো! জুড়ে দেবে কান্না আর নালিশ, ওমা, দাদুকে বলনা গল্প বলতে?

মাস্টার মশাই

নরেন ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই বাড়ীতে পড়েছে মাস্টারমশাইদের কাছ, রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। রমণী স্যারের কাছে প্রথমে শোনে ছন্দের-কবিতা, লেখা, চল্লিশ বছর আগে যা ছিল অভিধান বহিভূত ব্যাপার। ক্লাস সেভেনে সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিখলো নিজে পড়া ও পাঠক্ষেত্র স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা। প্রাচীন যুগে কথিত থাকলেও পঁয়ত্রিশ বছর আগে গুরু শিষ্যের শ্রদ্ধা ভালবাসা এত বিরল ছিলনা—সম্পর্ক ছিল স্নেহের। শিষ্য রাস্তায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরতো, গুরু কোরতো আশীর্বাদ, আমি ও মাস্টারমশাইকে।

স্কুল ছেড়ে কলেজ জীবন, চাকুরী জীবন, এবং বিবাহিত জীবনের পনেরো বছর পর বড় মেয়ের জন্য নরেন ভাবলো সর্বেশ্বর বাবুকেই রাখবে। সত্যনিষ্ঠ মাস্টার মশায়ের সুনাম ছিল পল্লীতে, খোঁজ পেতে অসুবিধা হোলনা। সস্ত্রীক গিয়ে নরেন বললো, মাস্টার মশাই এসেছিলাম মেয়েকে পড়াবার আবেদন নিয়ে। আবেদন সস্নেহে মঞ্জুর হোলো। সম্মান মূল্যের কথা উঠতেই মাস্টারমশাই হেসে বললেন, রিক্সাভাড়া আর কিছু দিস। ছাত্র নিশ্চুপ এর পর কথা চলেনা।
মাস্টারমশাই দুটো কবিতার বই দিয়ে বললেন, রেখেদে, মাস্টার মশায়ের স্মৃতি। আজও সে স্মৃতি রয়েছে সংগ্রহের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে।

মরু-নিরবতা

নামটি গোপন রাখতে ডাক-নাম, তিন্নিই বলছি। তিন্নির স্বামী জমিদার, তিন্নি বড়-উকিল বংশের।

এখন আর সেদিন নেই, স্বামী-হারা তিন্নি থাকে বসতির পাশের এক ছোট্ট আস্তানায়। তার এক ছেলে কখনো কিছু সাহায্য করে লোক পাঠিয়ে। সাহায্য কমই দেয় তুলনায় কিন্তু সম্পর্কটা বজায় রাখে।
হঠাৎ একদিন গাড়ী নিয়ে ছেলে এসেছে, আশে-পাশের লোককে দেখাবে বলে তিন্নি কত ডাকলো, সাড়া দিলো দুপুরের মরু-নিরবতা।

জীবনের রঙ

জীবনের রঙ লেখায়
কাঁটায়, আলোয়
সূর্য্য কোমল-কঠোর
সবুজ-লালে
এই সব রঙ
আজো অজানা
সবুজের উঁকি
মেলায় জলের দাগে।

প্রজন্ম

জীবনের-সায়াহ্নের এক সময় মেয়ের বাড়ী গেছি, যাবো জামাইয়ের অফিসে। নাতি গাড়ীতে উঠেছে চকোলেট হাতে। ট্যাক্সিওলাকে বললাম, ভাই পার্ক করো এখানে। পার্ক করছে, হাত নেড়ে বলছি এসো, এসো! মেয়ে-নাতি দেখছে আর খিল-খিলিয়ে হাসছে পেছনের কাঁচের ওপারে। হাসি সংক্রমিত হচ্ছে মুখে, মনে হোল মেয়েকে ছোট বেলায় হাঁটি-হাঁটি শেখাচ্ছি আর মেয়ে এরকমই হাসছে। না, ও এখন মিসেস চন্দ্রিমা চৌধুরী নয়, আদরের ছোট্ট বুলবুলি।

মাস্টার মশাই

নরেন ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই বাড়ীতে পড়েছে মাস্টারমশাইদের কাছ, রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। রমণী স্যারের কাছে প্রথমে শোনে ছন্দের-কবিতা, লেখা, চল্লিশ বছর আগে যা ছিল অভিধান বহির্ভূত ব্যাপার। ক্লাস সেভেনে সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিখলো নিজে পড়া ও পাঠক্ষেত্র স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা। প্রাচীন যুগে কথিত থাকলেও পঁয়ত্রিশ বছর আগে গুরু শিষ্যের শ্রদ্ধা ভালবাসা এত বিরল ছিলনা—সম্পর্ক ছিল স্নেহের। শিষ্য রাস্তায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরতো, গুরু কোরতো আশীর্বাদ, আমি ও মাস্টারমশাইকে।

স্কুল ছেড়ে কলেজ জীবন, চাকুরী জীবন, এবং বিবাহিত জীবনের পনেরো বছর পর বড় মেয়ের জন্য নরেন ভাবলো সর্বেশ্বর বাবুকেই রাখবে। সত্যনিষ্ঠ মাস্টার মশায়ের সুনাম ছিল পল্লীতে, খোঁজ পেতে অসুবিধা হোলনা। সস্ত্রীক গিয়ে নরেন বললো, মাস্টার মশাই এসেছিলাম মেয়েকে পড়াবার আবেদন নিয়ে। আবেদন সস্নেহে মঞ্জুর হোলো। সম্মান মূল্যের কথা উঠতেই মাস্টারমশাই হেসে বললেন, রিক্সাভাড়া আর কিছু দিস। ছাত্র নিশ্চুপ এর পর কথা চলেনা।
মাস্টারমশাই দুটো কবিতার বই দিয়ে বললেন, রেখেদে, মাস্টার মশায়ের স্মৃতি। আজও সে স্মৃতি রয়েছে সংগ্রহের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে।

মরু-নিরবতা

নামটি গোপন রাখতে ডাক-নাম, তিন্নিই বলছি। তিন্নির স্বামী জমিদার, তিন্নি বড়-উকিল বংশের।

এখন আর সেদিন নেই, স্বামী-হারা তিন্নি থাকে বসতির পাশের এক ছোট্ট আস্তানায়। তার এক ছেলে কখনো কিছু সাহায্য করে লোক পাঠিয়ে। সাহায্য কমই দেয় তুলনায় কিন্তু সম্পর্কটা বজায় রাখে।

হঠাৎ একদিন গাড়ী নিয়ে ছেলে এসেছে, আশে-পাশের লোককে দেখাবে বলে তিন্নি কত ডাকলো, সাড়া দিলো দুপুরের মরু-নিরবতা।

জীবনের রঙ

জীবনের রঙ লেখায়
কাঁটায়, আলোয়
সূর্য্য কোমল-কঠোর
সবুজ-লালে
এই সব রঙ
আজো অজানা
সবুজের উঁকি
মেলায় জলের দাগে।

প্রজন্ম

জীবনের-সায়াহ্নের এক সময় মেয়ের বাড়ী গেছি, যাবো জামাইয়ের অফিসে। নাতি গাড়ীতে উঠেছে চকোলেট হাতে। ট্যাক্সিওলাকে বললাম, ভাই পার্ক করো এখানে। পার্ক করছে, হাত নেড়ে বলছি এসো, এসো! মেয়ে-নাতি দেখছে আর খিল-খিলিয়ে হাসছে পেছনের কাঁচের ওপারে। হাসি সংক্রমিত হচ্ছে মুখে, মনে হোল মেয়েকে ছোট বেলায় হাঁটি-হাঁটি শেখাচ্ছি আর মেয়ে এরকমই হাসছে। না, ও এখন মিসেস চন্দ্রিমা চৌধুরী নয়, আদরের ছোট্ট বুলবুলি।

ডাইরী থেকে

ঘরোয়া

"মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যতকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

ওঁ মাধব হৃদি, মাধব বাচি, সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবম্।

যাবার আগে টুকিটাকি কেনা হোল বিদেশের স্বদেশী আত্মীয়দের জন্যে। অফিসের 'অনুমতি-পত্র নিয়ে ভ্রমণ সংস্থায় দরখাস্ত কোরলাম পাশপোর্টের। পাশপোর্ট পেয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে ও আমেরিকাব স্বজন-ভাইয়ের স্পনসর-চিঠি নিয়ে কনস্যুলেট অফিসে অফিসে আবেদন করলাম, পেলাম। দুরু দুরু বক্ষে যাবার দিন এগিয়ে এলো, এতো অর্ধ-পরিচিত ভারতে ঘোরা নয। আশা-আশংকার আলো ছায়া নিয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে সহধর্মিনী মঞ্জুষা, ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ চন্দ্রিমা, শর্মিলা, দেবদেব, স্মিতা এবং জামাই কল্লোল ও নাতি কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে দমদমে এলাম। এখানে আগেও কয়েকবার এসেছি, দেখেছি বিদায় সম্ভাষণের মধ্যে কান্নার আবেগ কিন্তু এ যেন মরশুমী ফুল দেখা নয়, আনন্দ-অস্বস্তির মধ্যে ফুল হয়ে ফুটে ওঠা। কাস্টমস-চেক, বিদেশে ভ্রমণের প্রমোদকর দেওয়া ও যাবার প্রয়োজনীয় ফর্ম জমা আগেই সারা হয়েছে এখন মাইকে ডাকের প্রতিক্ষায়। ছোট মেয়ে স্মিতা দুষ্টমি করছিল, একজন সাধারণ পোষাকের পুলিশ তাকে আটকাতে গেলে তাকেই পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাতে সে ও আমরা হেসে উঠলাম। কিছু পরে মাইকে যাত্রা-শুরুর আহ্বানে উঠে বিমান-পথে-পা বাড়ালাম। বিমান সেবিকার শুভকামনা ও পথ-নির্দ্দেশ নিয়ে নিজ নিজ আসনে বসলাম। বিমান সেবিকারা প্রয়োজনে অক্সিজেনের ব্যবহার, বেল্ট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বলে চলে গেল। উপরে লাল লেখা দেখে বেল্ট বেঁধে ঈশ্বরকে স্মরণ করে বসলাম। প্লেন মেঘ ভেদ করে ওঠার সময় বেশ বাম্প কোরলো। উপরে উঠে স্থির হলে বিমান সেবিকা এসে স্ন্যাকস্ দিলো। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে দিল্লীর ইন্দিরা ইন্টারন্যাশনালে নামলাম। আবার কাসটমস্ চেক সেরে টিকিট দেখিয়ে ইংল্যাণ্ডগামী এয়ার ইণ্ডিয়ার এয়ার-বাসে উঠলাম। মেঘ ভেদ করে ওঠার সময় ও কিছুক্ষণ পরে প্লেন বেশ বাম্প করে চাঁদ তারার কাছাকাছি উঠে স্থির ভাবে উড়তে শুরু কোরল, ডিনার এলো। কেউ

কেউ টাকা দিয়ে মগ্যপান করলেন, হাজার হোক "হোমে" যাচ্ছেন তো। আমাদের সবাই ঘুমিয়েছে আমি ক্লান্ত হয়ে ভোর রাত্রে চোখ বুজলাম ঘুম ভাঙ্গলো সুর্য্যের "জবাকুসুম সংকাশং দৃষ্টিতে।" নিশিথিনী এয়ার-হোষ্টেস জিজ্ঞাসা করলো, "কফি চলবে।" বললাম, সানন্দে, ধন্যবাদ। "হোষ্টেস বললো, "You are well come"। আমি এক গ্রোস সিগারেট নিলাম দশ ডলারে। স্থানীয় সাড়ে এগারোটায় প্লেন পৌছোলো হিথরো বিমান বন্দরে। কাস্টমসের ফর্ম ফিলাপ করে বেরোতে প্রায় সাড়ে বারোটা। বেরিয়ে দেখি শ্রী ও শ্রীমতী সঞ্জয় ও শ্রী ও শ্রীমতী সঞ্জিত সপরিবারে সাহাস্যে দাঁড়িয়ে। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ে পর ওদের দু'টো গাড়ীর সঙ্গে একটি ট্যাক্সি নিযে গেলাম সঞ্জিত বা বিনুর কুইন্সবেরীর বাড়ীতে। বেলা দু'টোয় লাঞ্চ খেতে বসলাম। গল্প-খাওয়ায় বিকেল হয়ে এলো। মেজদা-মেজবৌদি রাত্রির সংক্ষিপ্ত ডিনার সেরে দুই মেয়ে নিয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ওদের অক্সফোর্ডের বাড়ীতে চলে গেলেন। সূর্য্য অস্ত গেল রাত্রি নয়টায়। অনেক রাত্রি পর্ষন্ত পুরোনো দিনের নানা কথা নিয়ে আলাপ হোল। রাত্রি একটায় সবারই বিরতি, আমার কথা-মালা গাথা শুরু হোল ডাইরীর পাতায়।

পরদিন এলড্রিজের রাস্তার ধারে বাড়ীর সামনের ফুলগুলি হেসে উঠলো সূর্য্য দেখে, শীতে সূর্য্যের আলোই ওদের উষ্ণস্পর্শের প্রভাতি-চা। বেরিয়ে দেখি বাড়ীগুলোর পোষাকের একই রকম রঙ-ঢঙ্। সামনে গোলাপের / মরশুমীর রঙ-বাহার, পিছনে কিচেন-গার্ডেন। গাড়ী থাকে রাস্তায়। দেখি সেজ'র গৃহিনী স্বামী-পুত্রদের নিয়ে বেরুচ্ছে স্টেশনে ও স্কুলে পোঁছে দিতে। ছোট ননদ বা আমার স্ত্রীকে বললো, একটু শপিং ও কোরতে হবে, ব্রেকফাস্টের ব্যাপরটা একটু······", "আমার স্ত্রী বলল" "ও ঠিক আছে সেজবৌদি, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুরে এসো।" মিসেস বিনু বা রাখী ফিরতে আমরা বেরিয়ে ২ পাউণ্ড করে পাতালরেলের দৈনিক টিকিট করে ট্রেনে উঠলাম, রাখী পৌছে দিলো স্টেশনে। নির্দ্দেশিত স্টেশনে পৌছে উপরে উঠে ম্যাডাম্ "টুশো"র ওয়াক্স মিউজিয়াম দেখলাম। চমকে ওঠার মত চেনা-অচেনা মূর্ত্তিরা বিভিন্ন ঘরে, উঠোনে এবং বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ঘরে সঙ্গীতের ব্যাঞ্জনা সহ শোভা পাচ্ছিলো। উপরে খাবার ঘরও আছ। দর্শনী ভালই, মাথা পিছু প্রায় আট পাউণ্ড। মিউজিয়াম দেখে ম্যাকডোনাল্ডে খেয়ে একটু শপিং সেরে বাড়ী ফিরলাম।

পরদিন বড় মেয়ে ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মঞ্জুষা শপিং এ বেরোলো

ব্রেকফাস্টের পর। আমি, গোরা (জামাই) ও দেবাদেব (ছেলে) বেরুলাম লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের উদ্দেশ্যে নির্দ্দেশিত স্টেশনে। পাতালরেল থেকে এ্যাস্কালেটারের উপরে উঠে রাস্তায় পেঁৗছোলাম। জিজ্ঞাসা করে প্রথমে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গেলাম। বিরাট সৌধে নিপুন ভাবে সাজানো দুর্লভ-প্রাচীন দ্রব্যাদি, যেমন ঘাড়, মিশরের পিরামিড হতে আকর্ষণীয় মূর্তি-তৈজসপত্রদি ও অলঙ্কারাদি, পৃথিবীর প্রাচীন-তম বলে কথিত মানব-ফসিল ইত্যাদি। পৃথিবীর নানা মিউজিয়াম সংক্রান্ত জ্ঞানপূর্ণ পুস্তকাদিও এখানে বিক্রীত হয়। বেরিয়ে ম্যাকডোল্ডের স্নাকস খেয়ে এলড্রিজের পথে কুইন্সবেরী স্টেশনের দিকে রওনা হোলাম। পরদিন গেলাম ব্রিটিশ ন্যাশানাল আর্ট-গ্যালারী। দেখলাম পরিচ্ছন্ন চিত্রশালায় পুরাতন চিত্রাবলী সুনিপুণ শিল্পীদের দ্বারা (পৃথিবীবিখ্যাত চিত্র সম্ভার যিশুখ্রীষ্টের সময় হইতে) নবকলেবর প্রাপ্ত, সুশিক্ষিত নিষ্ঠায় প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রঙিন-দৃশ্যের চারুতা খর্ব্ব হতে দেয়নি শিল্পীর সুযোগ্য উত্তরসুরীরা। লাল-গোলাপী মখমলে মোড়া সোফার আরাম কেদারায় বসে চিত্রপ্রেমীরা দেখলাম আলাপ ও ভূয়সী প্রশংসায়রত পরস্পরে, স্বামী স্ত্রীতে। পুরু কার্পেটে মোড়া ঘর বিভিন্ন রঙে রঙিন। দেখি হাজার হাজার ছবির বই সু-মুদ্রিত হয়ে মনোহারিনী রূপে ডাকছে শিল্প প্রেমীকদের রূপ সাগরে ডুব দিতে। ফেরার সময় বিশ্ববিখ্যাত মাকডোনাল্ডের দোকানে রসনা তৃপ্ত করে প্রত্যাবর্তন। ফিরে সম্বন্ধীপত্নী বিরচিত পোলাও, মাছ, মাংস বিরিয়ানী চোব্য-চোষ্য লেহ্যপেয় খেয়ে পরদিন আর ঘুম ভাঙে না! ছোট গিন্নি (ছোট মেয়ে) মামন্ গলা জড়িয়ে ডাকলো, ওঠো বাপি শপিং-এ যাবে না ? উঠলাম। বিরাট বিচিত্র শপিং-সেণ্টার সারি সারি বহু বিচিত্র বস্ত্র-সুগন্ধী ভোগ্যপণ্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে স্বর্গীয় বার-বিলাসীনীর হাসী নিয়ে, পকেটের কম রেস্তোয় হুতাস আগুন নেভেনা! গিন্নির সেজবৌদি বলল, চল উপরে দেখবে চোখ ঝলসে যাবে দেখে! আমার স্বগত খেদোক্তি, তাহলে বাড়ী ফিরবো কি করে ?" দেহ ফেরে মন ফিরেও ফেরে না, এখানের সেফটিফিনও ভাল। পরদিন গেলাম কণ্ডাকটেড টুরে লণ্ডন শহর দেখলাম, হাউড পার্ক, ট্রাফলগার, স্কোয়ার বাকিংহাম-প্যালেস, টাওযার অফ লণ্ডনে দেখলাম পুলিশ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান দরজায় টিপিক্যাল ড্রেসে, অনেক ধৈর্য্য ধরে চোখের পাতা নড়ায় ও মধ্যে মধ্যে মার্চ্চ করা দেখে জীবন্ত বলে ধরা যায়, দূর থেকে দেখলে কেউ ভাববে স্ট্যাচু বা রোবট দাঁড়িয়ে, মানুষ নয়! সত্য সেলুকাশ, কি বিচিত্র এই দেশ! দুর্গের মধ্যে

রাজা রাণী ব্যবহৃত স্বর্ণখচিত দ্রব্যসম্ভার, রাজারাণীর পোষাকের প্রদর্শনী রাজকীয় কায়দায়, নীচে নেমে দেখি, পৃথিবীবিখ্যাত কোহিনূরসহ চারটি রত্নখচিত রাজ-মুকুট ও নানাবিধ রত্নখচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অলঙ্কার, প্রহরীরা দাঁড়িয়ে দেখতেই দিচ্ছে না ভাল করে, বলছে, আগে যাও, আগে যাও।

চরৈবেতি, চরৈবেতি, যতদূর নিয়ে যাবেন ততদূরই, তার এক ইঞ্চি বেশী নয়! একটুও না! পরদিন গেলাম মেজদার কাছে, সঞ্জয়দার কাছে অক্সফোর্ডে যাবার বাসে। শহর পেরিয়ে গ্রাম, ও শহরে। ঘাস-রঙ সবুজ কার্পেটে মেশে উঁচু নিচু ভূমির ব্যবধান অদূরে কোথাও গাঢ়তর সবুজ বনানী ফুল-ফলে মনোহারী। কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাংলো প্যাটার্ণের চাষবাড়ী, খামারবাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কোরছে গৃহস্বামীর। কোথাও বাঙ্গালী-পোষা পদ্ম-শালুক শোভিত পুষ্করিনীতে আকাশের নরম সূর্য্যালোকের টলটলে মুখ দেখানো কনে দেখা ছবি! প্রায় ষাট মাইল গিয়ে বাস থামলো শহরের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে দেহলী প্রান্তের বাসস্ট্যাণ্ডে। বসার ঘরের কাঠের মেঝে কার্পেটে মোড়া, অদূরে ভ্রমন সম্বন্ধীয় লিটারেচার ও ফুল গাছের টব। লণ্ডনের মত নয়, এখানে সকাল বিকালে ফুল শোয়েটার মাফলার লাগে, যুবকদের পৃথিবী রঙিন! মেজদা মেজবৌদি দু'টো গাড়ী নিয়ে এলো, সানন্দে নিয়ে গেল বাড়ী। কফি, স্ন্যাকস, যোগে হোল গল্প, পুরাতনী কথা, অনেক দিনের অকথিত কথাও। আলোচনায় যুগপৎ আনন্দ ক্ষোভের তুলির রেশ থেকেই যায়। পরদিন ভ্রমণ নির্ঘণ্ট রচিত হোল ব্রেকফাষ্টের ব্রাঞ্চের (ভারি ভোজ) আসরে, রচয়িতা শ্রী ও শ্রীমতী মেজদা! আইন-আঙ্গন কোর্টইয়ার্ডের গোলাপ বাতাসের সুরে তালে মাথা দোলাচ্ছে। সামনে রাখা মোটর শিশিরে কাঁপছে ও দূরের ঝাপসা চশমাওয়ালা দোকানকে ডেকে কি যেন কি বলতে চাইছে। রাত্রে অতীত বর্তমানের সেতুরচনার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক-বৈষয়িক সাম্ভাব্য চিত্রমালা প্রতিফলিত হোল কথামালায়, কখনো অস্পষ্ট কখনো স্পষ্টভাবে।

লণ্ডনের মত এখানেও মধ্যবিত্ত সব বাড়ীই ইঁট, কাঠ, কাঁচে তৈরী, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে, পুরু কার্পেটে মোড়া সুখী বেড়াল, হিসাবে বেড়ালের ভাগ্যেই শিকে ছেঁড়ে। বাড়ীর পিছনে কিচেনে গার্ডেনে দু'একটা ফলের গাছ। রাস্তায় দু'একটা ভবঘুরে গাড়ির আনাগোনা ঠাণ্ডা বাতাসে হতভাগ্যের মত। সকালের ঘুম এখনো ভালভাবে ভাঙ্গেনি, বাড়ীর দু'একজন উসখুস

করে পাশ ফিরে শুলো। ভাবলুম একজনের ঘুম ভাঙ্গাই কিন্তু থাক, কাজ নেই সাতসকালে অপ্রসন্ন গলা শুনে। রাস্তার ওপারের লাল, নীল, সবুজ, কমলা রঙের ফুল ভেজা গাছে ঢুলছে।

ক্রমশ এক-একজনের ঘুম ভাঙ্গলো। এক দফা কফি বিস্কুটের ফাঁকে মেজবৌদি ব্রাঞ্চের আয়োজন করতে লাগলো মেজদার সহযোগিতায়। সতেজ উৎসাহের হাসি সকলের মুখে খেলা করছে। কথায় কথায় ঠিক হোল বেরুবো Bourton-on the water এর গ্রাম্য-শহরে। পথে যেতে পেলাম উইটনী শহর, ছোট নদী, সবুজ উপত্যকা, পাইন-ফার এর স্নিগ্ধ ল্যাণ্ডস্কেপ। প্রায় ৭০।৮০ মাইল গিয়ে পৌছলাম গন্তব্যস্থানে। কৃত্রিম উপনগরী পল্লীনিগড়ে, মনে হয় হংস মধ্যে বকো যথা, তবুও আমরা শহুরে লোক, পরিচিত আবহাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। মাঝের ঝর্ণা-নদীতে রংবেরং-এর ছোট মাছ, সবুজ শ্যাওলায় গাছের ঝুরি নামা ছায়া। সবুজ নদীর পাশে মরশুমী-ফুল ও পাতাবাহারী গাছের সারি যেন দক্ষিণীর বেনীতে রঙিন হাসি। ত্ব'চারটে পাতাবাহারী ফুল-মেলা লতা বলছে, কিগো আমায় কেমন লাগছে। ছোট অনেক হোটেলের একটিতে বসে স্ন্যাকস খাওয়া হোল। হোল ছবি তোলা গ্রুপে। ফেরার পথে উইটনীর সুবিশাল শপিং সেণ্টার। পছন্দের জিনিষ কিছু ছিলো কিন্তু মেজদার সতর্কতায় হাত গোটাতে হোল। রাত্রে গল্পের পর সবাই যখন শুতে গেল তখন আরম্ভ হোল লেখা। পরে নিজেকে গুড-নাইট জানিয়ে কাজ শেষ কোরলাম। পরের দিন অক্সফোর্ড শহরের কিয়দাংশ দেখা সেরে শপিং, মানে মেজদার শপিং আমাদের জন্যে। দেখলাম মাটির নীচের লাইব্রেরী। খাওয়া-গল্প-ঘুম।

পরদিন গেলাম মিউজিয়মে, ছোট হলেও পসরা অকিঞ্চিতকর নয়। পরদিন আবার বাসে কুইন্সবেরীর পথে আবার দেখা হোল পটেরবিবি পাহাড়ী-সবুজ-কার্পেটের প্রাঙ্গণে দিকচক্রবালের বনানী-সংগীত। আমাদের গ্রামাঞ্চলে সবুজের প্রাধান্য থাকলেও ইউরোপীয় ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির মত, এদের চাষের জমিতে, পতিত জমিতে গাছ ও ঘাস সুষমভাবে বর্দ্ধিত—আগাছা শঙ্কুল এলোমেলো নয়। বিকালে পৌছলাম কুইন্সবেরীর ডেরায়। অক্সফোর্ড পরিক্রমার কথা সংক্ষেপে আলোচনা হবার পর নিউজার্সিতে ভাই-নীলের বাড়ীতে ফোন করা হোল, আগামী পরশুদিন ওখানে পৌছবার কথা। পরদিন ছেলেমেয়েরা ও বড়রা বিশ্রাম ও বাঁধাছাঁদায় কাটিয়ে বিকালে মোটরে শহরটা

ঘুরে ছোটখাট শপিং এ কাটালো, আমি একা লণ্ডন আর্ট মিউজিয়মে গেলাম ও খুচরো দু'একটা জিনিষ কিনে সন্ধ্যায় স্ন্যাক্স্ খেয়ে বাড়ী ফিরলাম।

রাত্রের গল্পগুজবের পর সবাই শুতে যাবার পরে ডায়েরী টেনে নিলাম। শহর লণ্ডন থেকে এ জায়গাটা প্রায় ৫০।৬০ মাইল দূরে। রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় একটা সিগারেটের দোকান অবধি নেই। কিনতে হলে যাও অদূরে দোকানে বা দূরে শপিং সেণ্টারে। এক রাস্তায় একই ছন্দের সব বাড়ী। শহর লণ্ডনে কোলকাতার ডালহাউসীর মত পুরোনো কিন্তু আরো বড় ও সুসজ্জিত বাড়ী দেখা যায়। কিছু জায়গায় পূর্ণনির্মাণ করে লণ্ডন শহরে বাড়ীর ছাঁদ ফেরানো হচ্ছে নূতন স্টাইলে। লণ্ডনে এরা কোন কিছুই প্রায় কিনতে না দেওয়ায় জিনিষপত্রের দাম বিষয়ে খবরাখবর লিখতে পারছি না। এদের বড় ফ্রিজে ও ডিনার ওয়াগনে জমা থাকে প্যাকেট করা নানাবিধ খাদ্যবস্তু, তাই এরা সপ্তাহে ২।১ দিনই বাজার করে। এদের কথা হল স্টেটসে যাও, ঘোরো এবং শেষকালে প্যারিসের খরচ রেখে জিনিস কিনো, ওখানে সবই বেশ সস্তা। মেজদারাও সকলে এলো, একসঙ্গে খাওয়া ও কিছু গল্প হোল, দুপুরে আবার হিথরোয। বিদায় বেলায় কিছু রুমাল ভিজলো কান্নার লবনাক্ত জলে—উষ্ণ করমর্দ্দন সেরে গেলাম প্লেনের দিকে। হাত নেড়ে বিদায় জানালাম ওদের, লণ্ডনকে।

আবার কাসটমস্ সেরে প্লেনে বসলাম। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের জন্যই বোধ হয় ভয় ভয় কোরতে লাগলো। নীচের পৃথিবী দূরে যেতে যেতে মেঘের স্তর পেরিয়ে হারিয়ে গেল নিলীমায। উঁচু-নিচু মেঘ তখন নীচে ও পাশে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ভেদ করেও যেতে হচ্ছিলো। মেঘের ফাঁকে মাঝে মাঝে নীচে গ্রামাঞ্চলের টুকরো ছবি, নদী, পাহাড় দেখা যাচ্ছিলো। টি, উবলিউ এর বিমান সেবিকরা উপরে উঠে বিমান স্থির হতে প্রথমে স্ন্যাকস্ পরে ডিনার নিয়ে এলো। রাত্রের প্রথম দিকে আমি চোখবুজে শুয়ে রইলাম, মধ্যে ২।১ টা সিগারেট চলল। শেষের দিকে ঘুমিয়েই পড়লাম। পরদিন বেলা সাড়েবারোটায় সমুদ্র পেরিয়ে নিউয়র্কের তীরভূমি দেখা গেল। মন কলম্বাসের নাবিকদের মত স্বাগত জানালো অজানা মহাদেশকে। কাসটমস্ সেরে একটু দেরী হোল ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিতে। তারপর ব্যাগ সংগ্রহ করে দেখি খুড়তুতো ভাই নীল সহাস্যে দাঁড়িয়ে। কুশল বিনিময়ের পর ও পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে এলো। বিরাট মার্কারী ফোর্ড। আমরা ছোট-বড় আটজন মালসহ একই গাড়ীতে উঠলাম।

নীল এয়ারকণ্ডিসন চালিয়ে ছিল, লণ্ডন থেকে এখন এখানে একটু গরমই মনে হোল। শহর নিউইয়র্ক, সমুদ্রের ধার দিয়ে শহরতলীর পাশ কাটিয়ে পঞ্চাশ/ষাট মাইল দূরে ছায়া ঘন নীলের নিউজার্সির বাড়ীতে পেঁছিলাম। সারি দিয়ে কোঅপারেটিভ হাউসিং এর একই রকম প্রায় বাড়ীগুলো সামনের চিলতে বাগান নিয়ে দাঁড়িয়ে। নামলাম, বেল দিতে মিলানী সোৎসাহে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। একটু পরে কেয়া এল চুল ঠিক কোরতে কোরতে। একপ্রস্থ কফি স্ন্যাকসের পর গল্প শুরু হোল। এটলাণ্টায় ফোনে সুজন-ডলুদের জানানো হল আমাদের আসার কথা। দূরে সুইমিং পুলের ওপরে ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত গেল। পিছনে গাছগাছালি দেখলে মনে হয় মিনি জঙ্গলের পাশে বাড়ী। পরদিন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ মোহনানন্দজী ওখানে উঠেছেন শুনে ফোনে এপয়েণ্টমেণ্ট করে গেলাম নিউইয়র্কে আর এক বাঙালীর বাড়ী। কফি-বিস্কুট এলো। লণ্ডন থেকে শিষ্য লোক পাঠিয়েছে মহারাজকে নিয়ে যাবার জন্য। কয়েক ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর উনি নামলেন, প্রণাম জানালাম। প্লেন ভ্রমণের উৎকণ্ঠা কেটে গেল। আশীর্বাদের অমূল্য সম্পদ শিরোধার্য করে পরদিন বিকালে গেলাম পশ্চিম উপকূলের শহর সানফ্রান্সিসকো, সুজনের জামাই আর্য্যদের বাড়ী। কুশল বিনিময়ের পর বাড়ী দেখা, স্ন্যাকসের পর ডিনার খেয়ে সকলে সকলকে গুডনাইট জানিয়ে সবাই শুয়ে পড়লো। স্তিমিত চোখে ডাইরী লিখতে বসলাম।

সানফ্রান্সিসকো আসার পথে প্লেনের নীচে দেখি ইতস্ততঃ মেঘের নীচে পাহাড়, উপত্যকা, খামারবাড়ী সংলগ্ন ক্ষেত, ধুতির সরু পাড়ের মত রাস্তা তুষার কিরিটী পর্ব্বতমালায়। হঠাৎ ঝড়ে মেঘ তাণ্ডব-নৃত্যতর মহাদেবের জটার মত এলো-মেলো হয়ে মেঘরাশিকে ছিন্নভিন্ন চারিদিকে করে ছাড়িয়ে দিতে লাগলো, পাদ-ভরে নীচের পৃথিবী ও প্লেন কাঁপতে লাগলো, সূর্য্যরশ্মির তীক্ষ্ণশর মেঘভাঙা রৌদ্রে চারিদিক উদভ্রান্ত করে সৃষ্টিকে একাকার করে দিতে চাইলো। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য আমাকে বিশেষভাবে শঙ্কিত কোরলো। মনে হোল কোন উল্টো ভগীরথ শিবের যথাযথ আরাধনা না করে গঙ্গাকে হর-কি-প্যারীতে না এনে চোখকে বাষ্পাকুল করে দিচ্ছে। মনে শান্তম্-শিবম্—অদ্বৈতমকে সৃষ্টি সহ আমাদের রক্ষা করতে বললাম। রুদ্রানীকে স্মরণ করে বললাম, প্রসীদ, বরদাভব, হে হরিনেত্র নিবাসিনী। চিন্তামনি তারা তারন করলেন, স্বামীকে সংযত করেলেন। বরাভয় হস্তের আশীর্বাদ নেমে এলো। শ্রীগুরুর চরনে শতকোটি প্রণাম

জানালাম। চোখ খুলে দেখি অনন্ত নীলাকাশ মেঘহীন, সূর্য্যকরোজ্জ্বলে পৃথিবী আবার আশুতোষের দয়ায় শান্তরূপে বিরাজমানা। দূরে সমুদ্র রেখার পাশে সানফ্রান্সিসকো শহর ক্রমশ কাছে এলো। প্লেন থেকে নেমে মনে মনে গায়ত্রী জপ করলাম। কাসটমস সেরে দেখি সুজন, নীল, ডলু, আর্য পম্পি দাঁড়িয়ে আছে, সকলের সঙ্গে সহাস্যে করমর্দন করে গাড়ীতে উঠলাম। আর্য্যর বাড়ী পৌঁছতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলো, আমার চোখে ঘুম। সর্ব্ব-কার্য্য-কারন হেতু জগন্নাথ-জগন্নিবাসকে স্মরণ করে শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম।

পরদিন উঠতে বেলা হোল। সুজন ডলু, পম্পির শ্বশুর-শাশুড়ী আগেই এসেছেন, উপলক্ষ্য পম্পি-আর্য্যের ছেলের অন্নপ্রাসন। আর্য্য ইঞ্জিনিয়ার হলেও বেশ খোলা-মেলা ছেলে। আর্য্যের বাবাও ছেলেরই মত, কখনো গাইছেন, বাঁশি বাজাচ্ছেন নাতি হওয়ার আনন্দে। ব্রানচ্ খেয়ে অনুষ্ঠান বিষয়ে কথা হোল অনেক। পরে শপিং সেণ্টারে গিয়ে বিরাট ফর্দ্দ নিয়ে বাজার করা হোল, এরা বাড়ীতেই রান্না করবে জানলাম। অদূরে পার্কের সংলগ্ন হলে অনুষ্ঠান হবে, শুনলাম নিমন্ত্রিত আসবেন দেড়শোর মত। দুপুরে খেয়েদেয়ে কাটা-কাটি, রান্নার তোড়জোড় চলল। পরের দিন কাটলেট, চপ, ফ্রায়াড রাইস, মাংস ইত্যাদি ভাজা ও রান্না হোল সন্ধ্যায় ভাড়ার ভ্যান গাড়ীতে রান্না খাবার চললো আপ্যায়ণ-গৃহে। ওখানেই চেয়ার টেবিল দেয় কিন্তু নিজেরা এ্যারেঞ্জ করে নিতে হয়। এখন সবাই ব্যাস্ত গরদের জোড় টোপর সোনার হার পরা বাবু-সোনাকে নিয়ে। ওর দিদি মুখ শুকিয়ে ঘুরছে, যেন বিদেশিনী। এখানে লোককে অন্ততঃ ফোনে না অনুরোধ করলে আসে না। ভারতের মত না বলে কয়ে "কিহে কেমন আছো সব" বলে এসে গল্পে বসে যাওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে। তবে পার্টি দিলে অনেকেই আসে, সে সময়ে সকলে এসে গল্প করে খেয়ে উপহার দিয়ে যায়। ফোনে দুঃখও জানায়, কাজ থাকায় পার্টির আনন্দ মিস করার জন্য। আমাদের সঙ্গে এদের সামাজিকতা বা প্রীতিভোজের ব্যাপার-স্যাপার অন্যরকম। এসো, কোক্ পানকর অথবা গল্প কর এর ওর সঙ্গে, টেনে নিয়ে এসো হাসি, শুকনো ভদ্রতায় উইশ্ করো। প্রথমে পিয়াজী বা মাংসের-মাছের চপ, কাটলেট ঘুরে ঘুরে খাও, আইসক্রীম কোক্ বা অন্য পানীয়। ম্যাজিক শো দেখো। না দেখো তো গল্প করো, কোন ব্যাপার নেই। পরে ক্লান্ত হয়ে প্লেট হাতে লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে খাও।

আমি ছিলাম অভ্যর্থনার চার্জ্জে। সুজন বলল হাত জোড় করে আসুন

বস্থন নয়, হ্যাণ্ডসেক করে হাই বা গুড ইভনিং জানিয়ে পথ দেখাতে হবে। আমি মধ্য পথে গেলাম, হাত জোড় করে বললাম হাইই, গুডইভনিং, দিস সাইড প্লীস। আর্য্যর দু'চারজন বিদেশী অতিথিও আমার মত হাতজোড় করে প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে ঠিকঠিক না পেরে হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছিল। এক জন ম্যাজিশিয়ান মহিলাকেও এভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম, যাবার সময় হয় তো শ্রদ্ধা জানাতে ভদ্রমহিলা বিদেশী ফ্লিমে দেখা দৃশ্যের মত একটু নিচু হয়ে হাতে চুম্বন করেছিলেন, দেখে মনে হোল এদেশে এরকম প্রফেশানালদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভদ্র ব্যবহার বোধহয় করা হয় না।

মধ্যে গিয়ে আসনে বসে পড়ে, কোক সিগারেট সহ পরিবেশ অধ্যয়ন করছিলাম। কিছু গুজরাটি বা গুজু পিয়াজীসহ মদ্যপান করছিলেন গদগদ ভাবে। বোধহয় ব্যবসায়িক কথা হচ্ছিলো ওদের মধ্যে হাসির আড়ালে।

গোপনে চুমুও আর্য্য-পম্পি ছুঁড়লো দেখলুম পরস্পরের দিকে। পরিবেশনের ব্যাপার ও এদেশে নেই। সাজানো খাবার থেকে চামচে করে প্লেটে তুলে নাও। মহিলাদের মে আই হেল্প ইউ বলাটা কার্টসি ও দেশে। ওরা প্রত্যুত্তরে বলবে থ্যাঙ্কস্ এবং তার প্রত্যুত্তরে বলতে হবে, ইউ আর ওয়েল কাম্। থ্যাঙ্কস জানালেই ইউ আর ওয়েলকাম বলাটা এদেশে শাস্ত্র সম্মত, তার বেশী কিছু নয়। সুন্দরীদের নিয়ে এদেশেও একটু বেশী আপ্যায়ন ও প্রগলভতা দেখানো হয় অমায়িকতার আড়ালে। ভোজের শেষ আকর্ষণ আইসক্রীম / কফি। একজনের শুধু কোক ইত্যাদি পানীয় দিতে দিতেই কোমরে ব্যাথা হয়ে গেল (বরফের কিউব দেওয়া সহ)।

এখানে পার্টি হয় ঘণ্টা ধরে। তিন বা চার ঘণ্টার জন্য হল ভাড়া নিয়েছেন তার মধ্যে হল ঝেড়ে-মুছে সাফ করে চেয়ার টেবিল গুদামের দরজার গোড়ায় রাখতে হবে ঠিক ঠিক সময়ে, একমিনিটও এদিওদিক হলে ঘণ্টায় দু'শো ডলার ফাইন, হাতে হ্যারিকেন। শেষ কয়জন আত্মীয়-পরিজন প্রাণ দিয়ে যেভাবে অল্প সময়ের মধ্যে হুড়োমুড় করে পরীক্ষা হলে শেষ সময়ের মত ঘড়ি দেখতে দেখতে কাজ করে গেল সে দৃশ্য ভারতে অদৃষ্টপূর্ব্ব, সদ্য এদেশে আসা ভারতীয়দের চোখে অভূতপূর্ব্বতো বটেই। টেনে আনা হাসি এখন রস-কষ-সিঙ্গাড়া-বুলবুলি-মস্কট হয়ে গেছে।

রাত্রে নিবিড় ঘুমের পর পরের দিন প্রয়োজনীয় গোছ গাছ করে লাঞ্চ খেয়ে

দুপুরের আগেই বেরুলাম, সময় নেই। ছুটির সময় এদেশে খুব দামী উপভোগের বস্তু। শুক্রবার সন্ধ্যায়ই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এদেশীয়রা উইক এণ্ড করতে চলে যায় সমুদ্রের ধারে বা হেলথ রিসার্টে। রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে ব্যাক-টু-প্যাভেলিয়ান।

গাড়ীতে বড়দের/ছোটদের দুটো দল করা হোল। মধ্যে পেট্রল নেওয়া সেরে স্ন্যাকস খেয়ে শরীর-মন চাঙ্গা করতে হয় মোটরের দূর ভ্রমণে। মিউজিক চলে স্বকণ্ঠে ও চিপস, কোক, সিগারেট ও অন্য জিনিষও চলে ফাঁকে ফাঁকে। ইয়ারকি-ঠাট্টা-ফাজলামো। বড়দেব পাইলট দুই ভাই সুজন ও নীল, ছোটদের ভাই-বোন পম্মি/ফুতু পালা করে। সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া আমরা পার হলুম রাত্রী সাড়ে-আটটায়, প্রায় সাড়ে দশটায় সাতশো মাইল দূরের স্যান্টএনার দেজ-লজে পৌছোলুম। ম্যাকৃডোনাল্ড এখানে ভরসা রাত্রি এগারটায়, স্ন্যাকস খেয়ে আবার ক্লান্তির নিবিড় স্লিপিং-পিল খাওয়া ঘুম। মাঝারি ধরনের এ লজে এয়ারকণ্ডিসণ্ড দুই ঘর-কাম-ড্রয়িং রুম-কিচেন, কমন বাথরুমের ভাড়া শূট প্রতি দুইশত ডলার। এটি পুরেনো ধরনের তাই চার্জ কম, শুনলাম, আধুনিকে কত জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে কোরলাম না। সকাল আটটার মধ্যে এখানের ফ্রি-ব্রেকফাষ্ট করা না হলে পরে নৈব নৈবচঃ। আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে, একটু বেড়ালাম লনে। ফোয়ার ফুলবাগান দেওয়া সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে রাস্তা আছে খাবার ঘরে যাবার। বুফের মত নিয়ে নিয়ে ব্রাঞ্চের মতই খেলাম পেট ভরে। একটু বেলায় ছোট বড়দের স্বপ্ন-সম্ভবের দেশ ডিসনেল্যাণ্ডে।

ডিস্নেল্যাণ্ডের কথা ও ইউনিভার্সাল স্টুডিওর কথা আগেই লিখেছি। ফেরার পথে দেখি নাম-না-জানা সৈকতশহর মনভোলানো আনন্দ-সামগ্রী নিয়ে ডাকছে, এসো, দাঁড়িয়ে একটু যৌবনের গান করে যাও কিন্তু সময় নেই। রাত্রি ভোর গাড়ী চালিয়ে পৌছতে হবে সাতশ মাইল পেরিয়ে সানফ্রান্সিসকো। চওড়া রাস্তা তিন/চারটি লেনে ভাগ করা, মধ্যেরটি খুব জোরে যাওয়ার জন্য, পরের দুটি একটু আস্তে গাড়ী চালানোর জন্য, তাও ঘণ্টায় ষাট মাইল। রাত্রের হেডলাইটে লেনের মাঝে মাঝে চকচকে বস্তু তারার মত চিকচিক করছে, যেন চাঁদে যাওয়ার রাস্তা। পাহাড়ে উঠলেও ঢাল এত ধীরে মসৃন ভাবে নামা-ওঠা করে যে বোঝাই যায় না পাহাড়ে উঠছি কি নামছি। দেখেছি সানফ্রান্সিসকোর

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচু রাস্তা এরকম, দুধারে পাইনের জঙ্গল, এরাই বনমহোৎসবের সার্থকরূপায়ণ করছে। রাস্তায় সিগারেট ধরিয়ে কাঠি ফেলতে গেছি, সুজন না-না করে উঠলো। আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, কিরে, কি হোল ?" বলল, দেখলে এক্ষুনি দু'শ পাঁচশ ডলার ফাইন হবে। মধ্যে ঘুম ছাড়াতে ও খেতে নামলুম। সুন্দরী মেয়েরা ঘুমন্ত চোখে অর্ডার নিল। খাওয়ার শেষে ছেলে-মেয়েরা ও অন্যান্যের আইসক্রীম্ নিল, আমি কফি শেষ করে সিগারেট ধরালাম। আবার যাত্রা শুরু করলাম আমরা। গাড়ী প্রায় সোজাই চলল, মাঝে মাঝে পাইন-মদিরায় জ্যোৎস্না ক্লান্ত বাঁক নিয়ে।

গাড়ী চলছে আর চলছে, ৬০। ৭০। ৮০ মাইল স্পীডে। এক জায়গায় দূরে দেখি বড় বড় লাল সাদা আলো। বললাম, থামা, কিজানি-কি হয়েছে! সুজন হেসে বলল, চল দেখি না। কাছে গিয়ে দেখি রাস্তা সারাই হচ্ছে যাতে কিঞ্চিত মদাসক্ত ও ভুল না করে তাই এত আলো। উচুতে উঠতে নামতে দেখি ব্যাক-লাইটের লাল সার দিয়ে আলোর সারি সৈনিকের নিষ্ঠা নিয়ে যাচ্ছে। হ্যা, আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল এখানকার রাজকীয় পথ নিঃশ্চিদ্র, অন্য রাস্তায় যেতে গেলে যাও ফ্লাইওভারের সাহায্যে। এইজন্য এইসব রাস্তায় লোকে-দের ৮০/১০০ কি. মি. বেগে গাড়ী চালাতে হয়। এ দেশীয় মেয়েরা যারা গাড়ী চালায় তারা এইসব রাস্তা এড়িয়ে গাড়ী চালাতে চায়। ঐ স্পীডে লেন চেঞ্জ করা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, এক সেকেণ্ডে জীবন যেতে পারে। গাড়ীর স্পীড মেনটেনের জন্য এখানে যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে গাড়ীর মধ্যে, মানুষের পক্ষে ৬০।৭০।৮০।১০০ কি. মি. পথ স্পীড একইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়। আরেকটি জিনিষ, একটু দামী গাড়ীতে অটোমেটিক গিয়ার ব্যবস্থা আছে, সময় কোথায় এসবের এই ব্যস্ত শহর গঞ্জে। বোধহয় খুব রাগ কোরছেন, ভাবছেন লেখকের গাড়ীর এলার্জি হয়েছে ওদেশে গিয়ে? না, মশাই, ওদেশে শহর ছাড়া ফুটপাত নেই প্রায়, লোকে শহর থেকে থাকে দূরে। তা' ছাড়া রেসিডেন্সিয়াল জায়গায় পান-তেলেভাজার মানে স্ন্যাকসের দোকানও নেই। হরে, দু'টাকার তেলেভাজা নিয়ায় ওখানে অচল, কাছাকাছি দোকানেও নেই। হরেকে রাখাও সাধারনের পক্ষে সম্ভব নয়, ঘণ্টায় দশ ডলার নিম্নতম মজুরী দিয়ে। মাসে ও হিসাবে ৮ ঘণ্টাতেই ২৫০০ ডলারের মত খরচ, পেছনে লণ্ঠন, হর্স-বিফোর-দি-কার্ট।

পথ, পথই চলাই জীবনভোর। যদিও সবাই নিজ নিজ পথের সন্ধানে চলেছি, সঠিক পথ না জেনেই।

যাইহোক অনেক পথ অতিক্রম করে সানফ্রান্সিসকোর জামাই বাড়ী পৌঁছোলাম রাত্রি প্রায় চারটে। ঘুম ভাঙিয়ে ঠাণ্ডা কাটাতে কফি-ব্রাণ্ডি খেয়ে শুলাম। উঠলাম সেই সকাল নয়টায়। এদেশ হলে বারোটা বা দুপুরে খেয়ে আবার ঘুম হোত, ওখানে সময়ের রেশন, আমাদের উঠতেই হবে, তাছাড়া না দেখলে আবার সব দেখা হবে কিনা কে-জানে কারন আমরা তো টাটা-বিড়লা-অভিনেতা নই।

যাই হোক উঠে ব্রাঞ্চ খেয়ে গেলাম পাহাড়ের উপরে সানফ্রান্সিসকো ইউনিভার্সিটিতে, এটা একটা পাহাড়ী জায়গা, উঁচু-নিচুর মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরম্য পাইনে-ফুলেতে বাহুল্য বর্জ্জিত ভাবে সুসজ্জিত। পম্মির মেয়ের (পাঁচ বছরের) নাচের রিহার্সাল ছিলো, আমাদের উৎসবের মত তবে একটু বড় ধরনের নাট্যমঞ্চ। কিছুক্ষণ পশ্চিমী নাচ দেখে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। অনেক অভিভাবকরা গেছেন স্বপ্ন নিয়ে, হয়তো নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন সার্থক হবে ছোট্টটির মধ্যে। এ বিশ্বের বোধহয় সব বাবা-মার স্বপ্ন—বিশ্ব স্বপ্নও/বিশ্ব-সত্যও। নতুন প্রজন্ম, নতুন ভাবে বাঁচার আশা আমাদের একটা বড় পাথেয়। যদি মায়া বলেন, মায়া ছাড়া বাঁচা দুঃস্বপ্নের নয় কি / বা মায়াহীন মনুষ্যাতীত দেবত্ব প্রাপ্তি সবার পক্ষে সম্ভবও নয়, তা হলে সকলকে শঙ্কর / বুদ্ধ / রামকৃষ্ণ হতে হয়। সেখান থেকে স্বর্ন সেতু বা গোল্ডেন ব্রিজ পেরিয়ে, এলাম ওপারে। এখানে দূরবীন ওজন নেওয়া যন্ত্রের মত পয়সা দিলে দেখা যায় সীমিত সময়ের জন্য, দেখা যায় দূরে উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী সানফ্রান্সিসকো কে। ক্লিক্ ক্লিক্ পরিচিত / অপরিচিত ক্যামেরায় মুহূর্মুহু ছবি উঠছে।

পেট্রল নিয়ে গেলাম ছোট উপ-নগরীতে, এখানে বাড়ীগুলি সমুদ্রের শোভা দেখতে দল বেঁধে নীচে নেমেছে সার দিয়ে। ছোট ছোট সুন্দর দোকানের সারী রাস্তায়, রাস্তার ওপারে প্যারীর মত বিভিন্নেরা, বালির ওপর সমুদ্র স্নান করছে সুন্দর-সুন্দরী নর ও নারীর সঙ্গে উপনগরী। আমরাও মনে মনে। এবার ফেরার পালা, চেনামুখ ব্রিজ, দোকান, রাস্তা পেরিয়ে শহরতলীর নতি উচ্চ টিলার বাড়ীতে আর্য্য বা টাট্টুর বাড়ীতে। কফি / চা / ব্রাণ্ডি / স্ন্যাকস্ সহ অনেকদিন না-বলা কথা-গল্পের ঝুড়ি নিঃশেষ করার ব্যাপার। জমজমাট মনিকা বা ডলুর রান্না ফ্রায়াড রাইস, মাংস বা আমার স্ত্রী মঞ্জুষা বা খুকির পোলাও কোর্মা, স্যালড আর টুকিটাকি নানারকমের খাদ্য।

কোক্ / এ্যাপিটাইজার তো আছেই। খাওয়ার শেষে সকলের আইসক্রীম খেয়ে গুডনাইট ও ঘুমের পর্ব্ব, আমার ডায়েরী নিয়ে বসার।

মনে এলো যাওয়ার পথের রাণী ঝর্ণার কথা, পাহাড়ী গৌরী কন্যা উজ্জ্বলতায় স্নান করছে, যতই যাবে বড় নদী আরো বড় হয়ে যাবে সে সাগরসঙ্গমে—পথে পড়বে নানাবর্ণের মাটি, শ্বাপদ-শঙ্কুল বন ও শহর, মালভূমি, সমভূমি ক্ষেত-খামার বাড়ী, এরই পাশ দিয়ে চলেছে জীবন-মৃত্যুর খেলা জরা-বার্দ্ধক্যের, নানাভাবে, নানারঙে, রসে, বর্ণে, গন্ধে।

এখানকার ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা বিষয়ে অনেকের মত আমারো খুব ভাল ধারনা ছিল না কিন্তু যা দেখলুম, শুনলুম তা ভিন্নতর। বড় হলে ছেলেরা স্কুলের বাস চালিয়ে, মেয়েরা দোকানে আংশিক কাজ করে হাতখরচ চালায়, চালায় নিজেদের অতিরিক্ত খরচ।

স্কুল শেষ করে অনেকেই চাকরী করে ঘর বাঁধে, না-মানসীর সঙ্গে নয়, সব সময়ে, কর্মরতা-সঙ্গিনীর সঙ্গে কারণ স্বচ্ছল জীবনের জন্য এখানে চাই দু'জনের রোজগার। যারা কলেজে পড়ে তারা পার্টটাইম করে পড়ার, এপার্টমেন্টের খরচ চালায়। এন্টারটেনমেন্টেরও। স্বপ্নবিলাস এখানে কল্পনাবিলাস। আরো ভালোভাবে বাঁচার ঘোড়া এখানে সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে ছুটছে। বিশ্রাম শুধু শনিবার / রবিবার। যৌবনেই রোজগার করার ব্যাপারটা এদের বে-হিসাবী হতে দেয় না—উচ্ছলতা এখানে লাগাম-পরানো। আরো একটা ব্যাপার আছে, কৈশর-যৌবনের অবাধ মেলামেশার ফলে এরা দৈহিক ও মানসিক জীবন সঙ্গী-সঙ্গীনি নির্ব্বাচনের সুবিধা পায়। এতেও ডাইভোর্স হয়, আমাদের দেশে যার বদলে চলে তাপ্পি। ডাইভোর্স সহজে করা উচিত নয় [redacted] কিন্তুভারতের হিন্দুদের মত কষ্ট ও ব্যায়সাধ্য হওয়াও উচিত নয়, সময় সাধ্যও। মা, রসে-বশে রাখিস।

ডিস্নেল্যাণ্ডের কথা মনে এলো, আমাদের মধ্যের ছোট্টর রূপকথার শহরের কথাও। বাল্যের দেখা মিকিমাউসের আবিস্কার কর্ত্তা ডিস্নের .কাটি ডলার-সমৃদ্ধ আনন্দ-বাবসার শহরের কথাও। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমন্ত পৃথিবীকে গুডনাইট জানিয়ে ছেলে মেয়ের পাশে লম্বা হোলাম। পরদিন সি-ওয়ার্লড দেখে বিশ্রাম। তারপর দিন নীল-সুজন আটল্যাণ্টার ও নিউজার্সির পথে রওনা হোল, আমাদের রেখে গেল আরো দু'চারদিনের জন্যে, পম্পিদের স্বান্তনা পুরস্কার হিসাবে।

পরদিন ব্রাঞ্চ খেয়ে বিশ্রামের দিন। সমবয়স্ক না হলেও পম্পির শ্বশুরের সঙ্গে পারিবারিক নানা কথা হোল। বিকালে পম্মি-আর্য্য ফিরে শহর দেখাতে নিয়ে গেলো। পাহাড়ে উঁচু নিচু শহরের এক দিকে চীনাদের বাসস্থান ও চীনাদের রেস্টুরেন্ট ও দোকান। সন্ধ্যায় ওরা চাইনিজ হোটেলে নিয়ে গেল, আর্য্য আগে থেকেই খাবার অর্ডার দিয়ে টেবিল বুক করে রেখেছিলো। রাত্রে খেয়ে বিশ্রাম।

সকালের সূর্য্য সবজায়গায় সমান আলোর সৌন্দর্য্য নিয়ে পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হোল না। পম্পি বলল, আজ তোমাদের ব্রাঞ্চের পর ডিপার্টমেন্টাল শপে নিয়ে যাব। বেস্ট, জে. সি. পেনী, ম্যাসী প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য বহু শাখা যুক্ত ডিপার্টমেন্টাল শপ. সঙ্গে ছোট ছোট নানাবিধ মনোহারী দোকানও আছে। "মল" এ খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের বিপুল সমাহার সীমিত ক্রয় ক্ষমতার জন্য দুঃখিত করে। বাড়ী ফিরে বিকালে বিশ্রাম ও গল্প করতে করতে রাত্রি হোল। ডিনার খেয়ে নিদ্রার বিশ্রাম।

পরদিন পম্পি আমাদের সকলকে শান্তাক্রুজ-বীচে নিয়ে গেল। সমুদ্র সৈকতে বাড়ী, হোটেল ও আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা দেখলাম। সবই বেশী দামী। স্ন্যাকস্ খেয়ে ছোটরা বেড়াতে গেল খেলার জায়গায়, আমরা বড়রা আইসক্রীম খেতে খেতে দূরে রঙিন ছাতা দেওয়া রৌদ্রস্নানের ব্যাপার দূর থেকে দেখলাম। এখানে ভ্রমণ-বিলাসীদের প্রাচুর্য্য দেখা গেল। মহিলাদের স্বল্পাবাস আমাদের কাছে বিশদৃশ লাগলেও স্থানীয়েরা এসব স্বাভাবিক ভাবেই নেয়। আকাশ সমুদ্র এখানে নীলকণ্ঠ!

পরদিন বিকাল অবধি বাড়ীতেই বিশ্রাম ও গল্প। সন্ধ্যায় জামাই আর্য্য নিয়ে গেল চকোলেটের দোকান-কাম কারখানায়। এত রকমের চকোলেট যে হতে পারে এখানে না এলে জানতে পারতাম না। ওপরে নানারকমের দামী দোকান। পম্পি কেনাকাটা কোরলো। খুকিরা সোনার জলকরা কিছু পোষাকী গহনা কিনলো।

পরের দিন যাবার দিন, সকাল থেকে গোছগাছ, দুপুরে একটু বিশ্রাম সেরেই গাড়ী করে এরোড্রোমে। হাতছানীর মধ্যে প্লেনে উঠলাম। সেণ্টলুই হয়ে আটল্যাণ্টা। বিমান সন্ধ্যার আলো ঝলমলে আটল্যাণ্টায় নামলো প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে। বিরাম এরোড্রাম। দু'পাশে ট্রেন চলছে। আমরা সমতল—এস্কালেটরে প্রায় মাইল খানেক গিয়ে পৌছলাম ব্যাগেজ

সংগ্রহ স্থলে। রাত্রি সাড়ে আটটায় গাড়ীতে উঠে সাড়ে ৯ টায় সুজনের বাড়ী। খাওয়া শোওয়া করতে এগারোটা। এখানে সকালে ব্রাঞ্চ খেয়ে রাত্রের ডিনার তৈরী করে বিকালে শপিং এ বেরুনো হোত। কেউ কেউ বাড়ীতেই টিভি দেখতাম। বাইশটা চ্যানেলের কোনটায় চব্বিশ ঘণ্টা গান, নাচ, থিয়েটার, সিনেমা, খেলাধূলা সবকিছুই দেখা যায়। রাত্রে খেয়ে শোয়া গল্পের পরে। মধ্যে শুক্রবার দুপুরে ফ্লোরিডার অর্লাণ্ডোতে গিয়ে পৌছতে রাত্রি হয়ে এলো। ম্যাগডোনাল্ডে খেয়ে দেজ ইন-এ শুলাম। পরদিন ডিস্নের এপকট সেন্টার দেখে বিকালে ডেটোনা-বীচ হয়ে ফিরলাম বাড়ী রাত্রি বারটায়।

পরের শনিবারে সুজন আমাদের ইটালীয় রেস্টুরেন্টে খাওয়ালো। রবিবার সুজনের এক বন্ধুর বাড়ী চ্যাটানুগায় গেলাম। এটা একটা রেড-ইণ্ডিয়ান নাম। বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয় চা-স্ন্যাকসে আপ্যায়িত করলেন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে। ওখানকার তুলনায়, সুজনরা বলল, বেশ বড় বাড়ী করেছেন, ৫।৭ খানা লিভিং রুম সাধারনতঃ ২।৩ খানা ঘর থাকে কিচেন, ডাইনিং এবং বসার ঘর + ২টি বাথ ছাড়া। অলঙ্করন বা furnishing এখনো ভাল করে হয়নি তাই একটু খালি দেখাচ্ছিলো দেওয়ালগুলো। মেয়েদের ঘর দেখা ছেলেদের কুশল সংবাদ আদান প্রদান সেরে উঠলাম। ওখানে এক এক রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় এক এক রকম দাম জমী-বাড়ীর, সুজন বলল এবং এ জায়গাটা বেশ দামী এরিয়া। গেলাম রুবি ফলস এ, এটা একটা ঝর্ণার নাম কিন্তু আমরা ঝর্ণা বলতে যা বুঝি ঠিক সেরকম নয়, পাহাড়ের ভিতরে উঁচু থেকে ভিতরেরই আর এক জায়গায় ঝর্ণার জল পড়ছে এখানে। এরকম অন্ততঃ আমি আগে দেখিনি, শুনিনি। নীচের জলাধারে নানারকমের কৃত্রিম রঙিন আলো ঝর্ণার জলের রঙিন উচ্ছলতা বাড়িয়েছে। ছোটরা ছবি নিল দেড় মাইল যে গুহা দিয়ে যেতে হয় প্রপাতে সেখানের। আমাদের ও। ফেরার সময়ে আবার সবুজ পাইন ফারের মেলা দু' পাশে, সঙ্গে অস্তগামী সূর্য্যের রঙিন-আভা ইঙ্গিত দিচ্ছে বিদায়ের, দিনেরও আমাদের নিউইয়র্কের পথে ফেরার। নিউইয়র্ক থেকেই আমরা যাবো প্যারিসে ভারতে ফেরার আগে।

দু'চার দিন খাওয়া থাকা লেখা গল্পকরা সেরে একদিন দুপুরে নিউইয়র্কগামী প্লেনে উঠলাম সজল চোখে। প্লেন উঠলো মেঘ ভেদ করে ঝাপসা চোখ আরো ঝাপসা করে। উঠছে আর উঠছে। এবার স্থির হোল, বিমান সেবিকারা নিয়ে এলো স্ন্যাকস। একই কোমরে বেল্ট বাঁধা খোলা, জানলা

দিয়ে মেঘের রাজ্যে উকি মেরে পৃথিবীর জল-স্থল-বাড়ী দেখা। নামা, একটু ভয়ে ভয়ে। ব্যগেজ নেওয়া ও বাইরে আত্মীয়দের দেখা কিন্তু প্যারিসে কোন আত্মীয় নেই। সেখানে হোটেল ঠিক করা আছে। নিউইয়র্কে ২।৩ দিন থেকেই যাব।

আবার নিউইয়র্ক বা আমেরিকা মানেই শুধু বড় বড় বাড়ীর জঙ্গলই নয়, এখানে ছোট বাড়ী আছে, আছে বড় ফ্ল্যাট বাড়ী। শুধু ম্যানহাটনেই ওয়াল ষ্ট্রীটের কাছে বাড়ীদের উঁচু হওয়ার প্রতিযোগীতা। সবচেয়ে উঁচু ওয়ার্লড ট্রেড-সেণ্টারে উঠলাম। পাশের চল্লিশ-সত্তর তোলা বাড়ীগুলোকে ছোট ভাইয়ের মত দেখাচ্ছে। স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি দেখলাম কাছেই সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপে। সেখান থেকে ফিফথ এভিনিউ এ পেলাম প্রসিদ্ধ দোকান বাড়ী দেখতে, এ রাস্তা কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীট। বাড়ী ফিরে গল্প ডিনার ঘুম। পরের দিন টুকিটাকি শপিং সারা হোল আর গোছগাছ। Ticket Confirm আগেই করা হয়েছিল, আবার গেলাম ভেরী ফাই করতে। পরদিন ব্রাঞ্চ খেয়ে আশপাশটা ঘুরে টুরে, মেয়েরা শেষ গোছগাছে ব্যস্ত। রাত্রে খেয়ে বেরুবার আগে নীল ফোনে জানলো হঠাৎ প্যারিস এরোড্রামে ধর্ম্মঘট হওয়াতে যাত্রা বাতিল হয়েছে।

পরদিন সকালে আবার এরোড্রামে ফোন করা হোল, রাত্রি সাতটা নাগাদ প্লেন ছাড়বে। আকাশ মেঘলা, হাওয়া সুরু হয়েছে এ অবস্থায় বাড়ী থেকে খেয়ে বেরুলাম। বিদায় সম্ভাষন, কাসটমস সেরে প্লেনে উঠলাম। ঝড় বাড়লো, হু-হু করে বৃষ্টি-ঝড় নামলো দু' ঘণ্টা এরোড্রোমে আটক থেকে সব থামতে প্লেন ছাড়লো। রাত্রির অন্ধকারে চাঁদ তারা কেবল সঙ্গী, ডিনার খেয়ে সবাই ঘুমুচ্ছে। পরদিন এগারোটায় প্লেন থেকে নাবলুম। ট্যাক্সিকে ইংরাজী অক্ষরে হোটেলের নাম দেখাতে ৫০।৬০ মাইল দূরে হোটেলে নিয়ে গেল, দুটি ঘর ভাড়া করাছিল, মাত্র দুইশত ডলারে শুধু থাকা। মালরেখে ঐ বড় ট্যাক্সি (লিমোসিন) করেই বেরুলাম। দূর থেকে দর্শনীয় স্থান দেখলাম শপিং সেণ্টারও ব্রাণ্ডি সেখানে সেণ্ট, সাবান, ব্র্যাণ্ডি কিনলাম। বাইরেই খেয়ে হোটেলে ঢুকলাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের-প্যারীকে আবার দেখলাম। পরদিন বাইরে ব্রেকফাস্ট সেরে সকলে Taxi ধরে আবার দ্যগল এরোড্রোমে। দুটি পুলিশ দেখি বড় কুকুর নিয়ে ঘুরছে। দুপুর সাড়ে বারটায় প্লেন ছাড়লো, ব থাষ্ট-এয়ার ওয়েসের ; যাত্রী বেশীর ভাগই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ; খাবার খু ভালো, এরা বিনামূল্যে মদ দেয়। অশ্রু সজল চোখে প্যারী বলল, বন-ভয়েজ।

নৈনী

নৈনী, নয়না, নয়ন—দেবীর
হিমালয়ের বুকে
সজল নয়না এই হ্রদ
দিঘীর স্নেহে পূর্ণ
হৃদয় জাহ্নবী

শান্তম্-শিবম্-সুন্দরম্
হিমালয়ের মৌন ধ্যান নিবিড় হয়
ব্রাহ্মমুহূর্তের ঘণ্টাধ্বনিতে
পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি নৈনী
এখানে তাঁর নয়ন

ঢেউ শান্ত সমাহিত
লেগেছে 'খ' য়ের নীলে
সবুজ সুদূরে।

দেশ—ভ্রমণে

সপরিবারে যাচ্ছি প্রবাসে, আপাতত: রাজধানীতে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে একে একে আলো নিভতে সুরু কোরলো, জ্বললো নীল আলো। জানলার ধারের বাঙ্কে আধশোয়া হয়ে সিগারেট ধরালাম, বাইরে মায়াবী চাঁদিনী মৃদু ফুরফুরে হাওয়া। ট্রেনের সঙ্গে ঘুম ঢুলছে দোদুল্যমান নেশায়। মধ্যে মধ্যে ছোট স্টেশনের আলো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্যামলী পৃথিবীর মাঝে মাঝে ঝুঁড়ে ঘরের জটলা; কোথাও বা দু'একটা পাকা বাড়ীতে জ্বলছে আলোর টুকরো। ডায়েরী লেখার এইতো সময়!

ফেলে আসা স্টেশনের মত মনে পড়ে আগে ঘোরা জায়গার কথা। প্রথমে দাদুর (মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের) সঙ্গে গিয়াছিলাম এলাহাবাদ। যাওয়াটা দারুন রোমাঞ্চকর হোলেও বাড়ীর দোলখেলা মিস করাটার কথা মনে হওয়াতে দুঃখও হোল। রাস্তার ধারে দোলের দিন কথাটা আবার মনে পড়াতে মনটা উদাস হয়ে গেল। রঙ মাখা একদলের একজন বলল, বাঙ্গালীতো, এসো আমাদের সঙ্গে! ইতস্তত: কোরতে সে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল আজকে আপন পর নেই। নিজের জড়তায় লজ্জিত হোলাম।

গেলাম সঙ্গমে, গঙ্গা-যমুনার শাদা-নীলে জড়াজড়ি করছে সেখানে। পাশেই দুর্গের মধ্যে কালা পাহাড়ের আঘাত প্রাপ্ত শিব রয়েছে যেখান থেকে নাকি রক্ত ও দুধের ধারা বেরিয়ে কালাপাহাড়কে করেছিল নিরস্ত্র, তার মন্দিরাদি ভাঙ্গার খেলায় হয়েছিল ইতি।

বাবার (৺শঙ্কর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের) কাছে কাশিয়াং এ (দার্জিলিঙের পাহাড়ী মাঝপথে) গেছি কলেজ জীবন থেকে তিন বছর আগে বাবার মৃত্যুর দিন অবধি প্রায় প্রতিবছরে। সরীসৃপ পথ পাহাড়-গাছের গা বেয়ে পাকদণ্ডী হয়ে উঠেছে, কখনো নেমেছেও। পাশেই মর্ম্মান্তিক খাদ দুটোগাড়ী সামনে এসে থমকালেই রক্ত চলকে ওঠে, মাথা যায় ঘুরে।

শিলঙের রিলবংএ ও থেকেছি সামার ভেকেসনে। বিষণ্ন পাইনের হাওয়ায় একলা লেগেছে নিজেকে।

ছোট খাট যাওয়ার মধ্যে প্রথম গেছি পুরীতে সমুদ্রের সফেন হাসির আওহ্বানে। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ অশান্ত যৌবনেরই প্রতীক মনে হয়েছে। গেছি দেবদারু পাইন-ইউকেলিপটাস সমৃদ্ধ শহরতলী রাঁচি হাজারি-বাগে, হুড্ড্রু ফলসের স্নেহ-ধারার কাছে। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সমুদ্র-শহর দীঘায়, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির অতীত স্মৃতি-তীর্থে, প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে-হাজারদুয়ারীতে, গৌড়-মালদহে, কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে, ডি ভি সির পাঞ্চেত বাঁধে। গেছি পরমহংস-সারদাখ্যাত কামারপুকুর জয়রামবাটি।

প্রস্তুতী নিয়ে গেলাম দূর সফরে—প্রথমে ঐতিহাসিক শিল্পকলা সম্বৃদ্ধ আগ্রায়। তাজের প্রস্তরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও সামগ্রীক সৌন্দর্য্য পৃথিবীর ভূ-পর্যটকদের নান্দনিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ফতেপুর সিক্রিতে ফটো তুলতে তুলতে ক্ষুধিত পাষাণে বন্দী হতে হতে বেঁচে গেলাম প্রহরীর আলোর ঈশারায়। স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে রাত কাটিয়ে পরের দিন জয়পুর হয়ে গেলাম আজমীর শরিফ্ এ। সেখানে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকালে পুস্কর তীর্থ হয়ে পা বাড়ালাম চিতোড়গড় দূর্গে। পাদ্মিনি মহল, ৺লক্ষী নারায়ণের মন্দির ও ৺কালী মন্দির দেখে রাতে পৌছলাম উদয়পুরে। ভোরে প্রাতঃরাশের পর গেলাম রাজপ্রাসাদ দেখতে। প্রাসাদের রঙিন কাঁচের কাজ সমৃদ্ধ ময়ূব মূর্ত্তি মনোহারী। উপরে রানীদের স্নানঘর ও প্রমোদ-উদ্যান। পরে গেলাম লেক প্যালেসে। সাহেলীয়োঁ-কি বাড়ীতে রাজা রঙ খেলতেন সখীদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি পাথরের ফোয়ারা দিয়ে জল পড়ছে চারকোণে অপূর্ব নির্ম্মল শৈলী এই প্রমোদ উদ্যানের। যেথান থেকে ফিরলাম জয়পুরে। সেথানে সিটি প্যালেস ও বিখ্যাত পাথরের মূর্ত্তি তৈরীর কাজ দেখলাম। সেদিন রাত্রে ঘোষিত হোল কেনেডির মৃত্যু সংবাদ রেডিওতে।

মন খুব খারাপ হোল, কেন জানিনা, বোধ হয় ওঁর প্রাণ খোলা হাসির জন্য।

এরপর গেলাম রাজধানী দিল্লীর কনট-প্লেসে, দূর থেকে দেখলাম প্রেসিডেণ্টের বাড়ী, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী, লোকসভা, কুতুব মিনার, মহাত্মা গান্ধির সমাধি, জুম্মা মসসিদ, জন্তর মন্তর ইত্যাদি। সেদিন হোটেলে রাত্রি বাসের পর গেলাম নৈনীতাল। অক্টোবরের শেষে সেকি শীত! পরের দিন

সকালে ছবি তুলেই নেমে এলাম বাসনে মীনাকাজের জন্য প্রসিদ্ধ মোরদাবাদে। বেনারসে পৌঁছলাম পরদিন। টাঙ্গা ভাড়া করে গেলাম ৺বিশ্বনাথের মন্দির, ৺অন্নপূর্ণার মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরে। সারনাথের স্তূপও দেখলাম, দেখলাম তার সামনের বড় বড় নানা রঙের গোলাপ ফুলগাছ শোভিত পার্ক।

গেলাম পুরী ঠাঁই নাই, সমস্ত হোটেল ভর্ত্তি। সমুদ্র-মন্দির দেখে রওনা দিলাম মাদ্রাজের দিকে। পথে শুনলাম সেখানেও সমস্ত হোটেল পূর্ণ মালয়ালাম সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে। গুড়ুর স্টেশনে নেমে রাত্রে ট্রেন পালটে গেলাম তিরুপতির দিকে। পাহাড়ের উপরে ভারতের সবচেয়ে ধনী মন্দির তিরুপতি। মন্দিরের চূড়া সোনার, মূর্ত্তি হিরে-জহরৎ-মণ্ডিত। সেখান থেকে মহাবলীপুরম হয়ে গেলাম মাদ্রাজে। মাদ্রাজ থেকে গেলাম কাঞ্চিপুরমে। দ্বিতীয়বার মাদ্রাজ হয়ে গেলাম বাস ট্রেন যোগে রামেশ্বরম্‌এ। দ্বীপ মন্দির রামেশ্বরমের প্রস্তর শৈলী চোল রাজাদের সহযোগীতায় নির্ম্মিত। এরপর উপত্যকা শহরের মধ্যে বিশাল মাদুরার মন্দির। সুউচ্চ গোপুরম্-এর দেব-দেবীর মূর্ত্তিসমূহ প্রসিদ্ধ।

রাত্রে ট্রেনে বাড়ী, মিষ্টি বাড়ী, নিশ্চিন্তিততার দেশে, বাইরে না গেলে হয়তো এ মধুরতা ঠিক বুঝতাম না।

কন্যাকুমারীতে গিয়ে পৌঁছলাম বিকালে বাসে। ষ্টীমার যোগে বিবেকানন্দ মন্দিরের উপাসনা ঘরে শান্ত সমাহিত পরিবেশে প্রার্থনান্তে গেলাম লজে। পরদিন বাস পরিবর্ত্তন করে রাত্রে মাদ্রাজে। মাদ্রাজে খুড়তুতো ভাই সুজনের সঙ্গে ট্রেন ও বাসে গেলাম উটি বা উটকামণ্ড-এর কুন্নরে। ওদের অফিসের গেস্ট হাউসে কয়েক দিন প্রচুর খাওয়া হয়েছিল প্রায় যা ইচ্ছা এবং যতইচ্ছা তাই।

এর পরে গেলাম সপরিবারে পাঠানকোট হয়ে বাসে জম্মু। পরদিন বাস যোগে ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাত্রা। জওহর টানেল পার হয়ে কিছু পরেই পৌঁছলাম শ্রীনগর। একদিন গুলমার্গ পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ গল্ফ খেলার মাঠ দেখলাম। পরদিন বাস যোগে উলার হ্রদে। স্থানীয় নগর পরিদর্শন ও কেনাকাটায় গেল পরের দিন।

পরের দিন বাসে পাঠানকোট ফিরে ট্রেনে দ্বিতীয় বার হরিদ্বার যাত্রা।

এখন হরিদ্বারের রূপ পাল্টেছে—শহর বেশ বেড়ে চলেছে। এরপর লক্ষ্ণৌয়ের "ভুল ভুলাইয়া" দেখে বাড়ী ফেরা।

পরের বার কাশ্মীরে গেলাম মার্চে। চারিদিকে বরফ-বরফ। ঝিরিঝিরি বরফ পড়ছে ইলশে গুঁড়ির মত। গাছের পাতা, হোটেলের মাথা সবই পাহাড়ের চূড়োর মত বরফে ঢাকা। গেলাম বরফ ভেঙ্গে পহেলগাওয়ে। সেখানেও হোটেল বরফ পড়ার জন্য বন্ধ। একটি খোলা কিন্তু খাবারের আকাশ ছোঁয়া দাম। ববফের জন্য বাসে ফেরার পথ বন্ধ। হোটেলের মিটার উঠছে দ্রুতগতিতে। অগত্যা টুার-প্রোগ্রাম পাল্টে Plane-এ যেতে হোল। পরদিন দিল্লীতে লোকাল ট্যুর সেরে বিশ্রাম। পরদিন কনট প্লেস ও প্যালিকা বাজারে কেনাকাটা। ফেরার পথে গেলাম বারাণসী—জয় বাবা বিশ্বনাথ!

দু'চার বছর দার্জিলিঙ, পুরীর পর আবার বেরুলাম বোম্বে। বেঙ্গলী লজে থাকলাম। স্কুটারে স্থানীয় ভাবে ঘোরা ও কেনাকাটার পর শুনলাম বর্ষায় ষ্টীমারে গোয়া যাওয়া যায় না। গেলাম রাত্রির বাসে। দ্বীপ-শহর গোয়া। চারিদিকে সমুদ্র, স্থলেও দু'চারটি দোকান ছাড়াছাড়া সুরার বিপনী। দু'দিনে ঘুরলাম প্রাচীন মন্দির ও গীর্জা। আবার ভ্রাম্যমাণ, গেলাম রাত্রির বাসে ব্যাঙ্গালোর। বেলুর—হ্যালেভিড হয়ে গেলাম পরদিন মহীশূর-প্যালেসে। রাজকীয় প্রাসাদের কিছুটা করেছে মিউজিয়াম—এরকম বর্ণাঢ্য প্রাসাদ রাজস্থানেও দেখিনি। এ পথেই টিপুসুলতানের সমাধি দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থান।

বাকি রয়েছে এখনও অনেক জায়গা। তারমধ্যে অজন্তা ইলোরা, মাউণ্ট-আবু, খাজুরাহো এবং সেকেন্দ্রবাদের সালারজং মিউজিয়াম। তাঁর অনুগ্রহ হলে আশা করি এ সবই পড়বে আমার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায়।

প্রাচীন ধর্মের ইতিহাস

"যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্"

সৃষ্টির জ্ঞানলগ্নে কিছু মহাপুরুষ ধ্যানানন্দে জীবন-যাপন করতেন তাঁরা ছিলেন সন্ধানী। গুহা মধ্যে চারিদিকে অন্ধকার, একপাশে প্রদীপালোকে স্থির দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে শিরার মত কেঁপে উঠছে তাঁর সন্নিধানের আশায়। আস্তে আস্তে মন স্থির হোল নিবাতকম্প শিব মৌনীতে। আরোপিত হোল দুই চক্ষুর মধ্যে অচিন্ত্যের ধ্যান। গুরু, গুরু, গুরু, গুরু, গুরুর কৃপাহি কেবলম্। হে সৎচিদানন্দময়ী, দিব্য চৈতন্যালোকে পৌছে দাও অহৈতুকী কৃপা বর্ষণে, নানাপন্থা বিশ্বতে অযমায়ৎ। হে মহামায়া, তোমার মায়াকুজ্ঝটিকা সরিয়ে ওউম্ স্বঃ কে দেখতে দাও, রেখে দাও সৎচিদানন্দ করে, ত্রিগুনাতীতা করে চিন্ময়ী ধ্যানে।

"ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপ হারিনি। / জয় সর্ব্বগতে দেবী কালরাত্রি নমোহস্তুতে ॥

ওঁ বন্ধুক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্। / স্ফুরচন্দ্রকলা-রত্ন মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।

ত্রিণেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নত ঘটস্তনীং/পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চভয়কং ক্রমাৎ ॥

ধতীং সংস্মরেন্নিত্য মুণ্ডরাম্নায়মনিতাম ॥ / কালীং রত্ন-নিবদ্ধ নূপুর লসৎ মনিতাম পাদাম্বুজামিষ্টদাং

কাঞ্চী-রত্ন দুকূল-হারললিতাং-নীলাং ত্রিনেত্রো জ্বলাম্/শূলগ্রন্থ সহস্র মণ্ডিত-ভূজামুদ্বক্ত্র পীনস্তনীং

আবদ্ধামৃত রশ্মীরত্ন মুকুটা বন্দে শিবাপ্রিয়াম্॥ "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হলীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ ॥

পূর্ব্ব গগনে ধীরে রক্ত-ললিতা জবাকুসুমশংকাসাং কাশ্যপেয় মহধৃতিম্ মূঢ় কাল-রাত্রি হারিনি, জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হোল—ওউম্ শব্দ শতাব্দীর ওপার থেকে হিমালয়ই ঋষিদের কণ্ঠস্বরে আদি-বনভূমি কেঁপে উঠলো যা আজো ত্রৈলঙ্গস্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, বিবেকানন্দ, ওঁকারনাথ হয়ে মোহনানন্দ মহারাজের সুকণ্ঠে দোলায়িত মূর্চ্ছনায়।

আত্মার মূল লক্ষ্য আত্মাস্থিত তাঁকে আবিষ্কার করা—এ সম্ভব তাঁর ইচ্ছায় প্রকৃতি সংযত হলে, মায়ার আবরণ সরলে। সর্ব্বধর্মের ইহাই শেষ কথা। বহিরঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন হলেও মূললক্ষ্য এক। জন্ম মাতৃগর্ভে কিন্তু দেহাবশেষ মাটিতে বিলীয়মান হয়, আত্মা হয় বিশ্ব আত্মায় সংযুক্ত। যিশু সাধারণের জন্য বলছেন, পিতা স্বর্গে অবস্থান করছেন। অন্যের জন্য বলেছেন—আশীর্বাদ প্রাপ্তরা বিশুদ্ধ আত্মা, তারাই দেখবে ঈশ্বরকে। ভাষা, পদ্ধতি সংস্কার বাদ দিয়ে দেখলে দেখা যায় সব ধর্মই 'একের' উপাসনায় ব্যস্ত, বিজ্ঞান বলে 'শক্তি।' সেই এক, অদ্বিতীয় কে অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম যেন নদী, নিয়ে যাবে সাগরে, 'তাঁর কাছে ঈশ্বর / আল্লা / গডের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব অনুভব কর। ভেতরে যাও, ভেতরে, আরো ভেতরে, তরঙ্গ আর নেই, স্থির হয়ে গেছে সত্যে। বিশ্ব সত্য এক, অভিন্ন সেখানে পৌছতে হবে, পৌছবার পথ আবিষ্কার করতে হবে ধ্যান-জ্ঞানে। সত্য অনুশীলন না করলে তা স্মৃতির পাতায় "ম্যমি" হয়ে যায়। ওঠো, আবিষ্কার করো নতুন আলোক-চিন্তায়—এ সবই আমরা জানি কিন্তু নানা সংস্কারের জন্য মন থেকে মানতে পারি না। আজ সংসার প্রতিপালনের জন্য আমরা ব্যস্ত, ব্যস্ত অবসর বিনোদনের জন্য আত্ম-বিশ্লেষণ, আধ্যাত্ম অনুভূতির আজ সময় কোথায়? মনে স্বাভাবিক ভক্তি ভাব-ভাবনা আসে কিন্তু চলে যায় শরতের মেঘের মত কাজের স্রোতে, অকাজেরও!

বেদ-বেদান্ত গীতা-উপনিষদ, কোরাণ-বাইবেলে, গ্রন্থ সাহেবে, বৌদ্ধ-জৈন ধর্মগ্রন্থে তাঁর কথাই লেখা আছে ঐতিহাসিক নানা ভাষায়-ছন্দে। দর্শনেও!

প্রাচীন ধর্মের ইতিহাসের সঠিক চিত্র আমরা প্রায়ই পাই না। ভারতের হস্তিনাপুর ও কৌসাম্বীর নিম্নতলের বয়স পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন ৯০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ, বেদ রচনার সম্ভাব্য সময়। স্থাপত্য-কলাবিদদের অনুযায়ী আনুমানিক ৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়া থাকে (খননের দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে সেই অনুযায়ী)। রামের নামও ইতিহাসে সেরূপ প্রাধান্য পায় নি যেমন তার শশুর জনকের নাম। আসলে দেবতা / অসুর, রাম / রাবণ, কৌরব / পাণ্ডব সবই ধর্মের নিরিখে / ন্যায় / অন্যায়, পাপ / পুণ্যের দিশারী। বুদ্ধের সময় জনক রাজার বেশ পরবর্ত্তীকালে লিছবীদের আক্রমণের সমসাময়িক! এই সময় থেকেই বৌদ্ধ মঠের উন্নতি হয় বিম্বিসারের

সময় থেকে, যাদবেরা প্রায় এই সময়েই মথুরায় বাস করতো। পূর্বে বেদ জানতো অল্প সংখ্যক ঋষিরা, কয়েক শতাব্দী পরে আর্য্যরা, ব্যবসায়ীরা লিপি ও মুদ্রার সৃষ্টি করে। চার্লস উইলকিনস ভাগবৎ গীতা ১৭৮৩ সালে এবং মনুর বই ১৭৯৪ সালে অনুবাদ করেন ইংরাজীতে ; একজন (Dukerson) পারসিক মণীষী খৃষ্টপূর্বে ১৭ শত সালের পারসিক সাহিত্যকর্ম থেকে উপনিষদের অনুবাদ করেন। কানিংহাম এবং মার্শাল ইণ্ডাস সিভিলিজেসন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আর ডি. ব্যানার্জি মহেঞ্জোদাড়োর বস্ত্র সামগ্রী আবিষ্কার করেন।

আনুমানিক ১,০০০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাবে শোয়ান সংস্কৃতির প্রস্তর নির্মিত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে যাহা পশ্চিমের তৎকালীন অবিষ্কৃত দ্রব্যাদির অনুরূপ। অধুনা কালীবাগান ও পাঞ্জাবের রোপারে গুজরাটের লাথালে (Lathal) খননকারী কার্য্য চালিয়ে স্থাপত্য বিজ্ঞানীরা আর্য্যদের আগমনের পূর্বের বস্তু সামগ্রী পাইয়াছে (প্রায় হাজার দু'যেক শীলমোহর পাওয়া গেছে)। মস্তকে সিং যুক্ত শিবমূর্ত্তি পাওয়া গেছে এখানে। পাণ্ডুরাজার ঢিপি খৃষ্টপূর্বে দ্বিতীয় মিলিনিয়াম পূর্বের। আনুমানিক খৃষ্টপূর্বে ১ মিলিনিয়ামে ঋকবেদ রচিত হয়েছিল। বাসেনগরের উৎত্তীর্ণ খোদাইয়ে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্বে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দীতে বাসুদেব বা নারায়ণ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিজয়নগরে হরি-হরের মন্দির দেখা যায়। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মাতৃমূর্ত্তিই মহামায়া, শিবের অর্দ্ধাঙ্গিণী। উড়িষ্যার কোনারকে প্রাচীন সূর্য্যমন্দির এখনো দ্রষ্টব্য। বুদ্ধের সময় ভারহুত, সাঁচি স্তুপ ২০০ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট। করালী এবং পুনার কাছে ভোজ চৈত্য নির্মিত হযেছিল প্রথম খৃষ্টাব্দে। অজন্তা ইলোরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে অষ্টম খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। কাশ্মীরে মার্ত্তণ্ড মন্দির ৮ম খৃষ্টাব্দে, দেওঘরের মন্দির নির্মিত হয়েছিল অষ্টম খৃষ্টাব্দে। এই সময়েই প্রায় মামলাপুরম, বাদামী ও আইহোলের ভাস্কর্য্য সৃষ্ট হয়েছিলো। তাঞ্জোরের শিবমন্দির কোল রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ১০ হইতে ১২ খৃষ্টাব্দে। কুম্ভকোনমের রাজা-রাজা মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১০০০ খৃষ্টাব্দে।

দিদারগঞ্জের যক্ষী (পাটনা) খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর, ভারহুতের ভাস্কর্য্য ১৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের।

পানিনির অষ্টাধ্যায়ী খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে, পাতঞ্জলীর মহাভাষ্য খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, হয়াদিত্যের কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হয়েছিল।

পঙ্গু

নাঃ, হাত-পা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকই আছে, নেই মানসিক ভারসাম্য অবিনাশের। জড়বুদ্ধি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে বাবা মা পাঠাতো রিক্সা করে বেড়াতে, রিক্সাওলা আমাদের বাড়ীর সামনে রিক্সা রেখে কাজ সারত। অবিনাশ পাশবিক একটা আওয়াজ করত যখন পাড়ার ছেলেরা রাগাত তাকে। একদিন পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি বললাম, "ভাল"! সে বলল, "ভালো, তুমি ভাল।" বোবা হয়ে গেলাম।

বিষয়

সতীশকে অনেকে হিংসা করে ভালো অবস্থার জন্য, প্রতিবছর বেড়াতে যাওয়ার জন্য, আরে৷ অনেক কারণে-অকারণে! তারা জেনেও জানে না টাকা জোগায় পি. অফ, কো-অপ লোন। এমনিভাবে চলছিলো, চলল না। বাবা মারা গেলে এলো সম্পত্তির সমস্যা। ব্যবস্থা করে সে ফরেনে গেলে, হিংসার নব-জন্ম হলো।

ষ্ট্যাইল

শেষের কবিতায় ষ্ট্যাইলের গোড়ার কথা লেখা আছে, বোধ হয় শেষেরও।

সাধারণ জীবন ছকে বাঁধা, নির্দ্দিষ্ট বৃত্তে ঘোরে। কাজ ছাড়া হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, ষ্টিরিও, টিভি, হোটেল-হলিডে হোম, স্বদেশ বিদেশ ভ্রমণও এখন নিয়ম-মাফিক। ষ্ট্যাইল নিয়মের ব্যতিক্রম তাই দুর্লভ।

সুমিত দিল্লী প্রবাসী ছেলে, কাজ করে বন্ধু রবির অফিসে। অবিবাহিত সুমিত পছন্দসই পোষাকে, সংযত অথচ রস-পূর্ণ কথায়, মিষ্টি গজলের ঝলকে প্রাণোচ্ছল বিশেষ করে মহিলা মহলে। সুমিত বলে, বিয়ে করলে মেজাজটাই চলে যাবে, নিয়মিত চলা, নাঃ ও আমার পোষাবে না।

কলি

মুখ ও নাম পদ্মকলি। বাবা-মা সংক্রামক রোগে একসাথেই গেলেন। কলির উপর পড়লো ভাই-বোনের দায়িত্ব। লাভের মধ্যে পেলো বাবার অফিসে চাকরী। পঞ্চাশের শুকনো মুখে কাঠিণ্যের ছোঁয়ায় তার বিদ্রুপের আভা, ছোটরা বড় হয়ে ধরেছে নিজেদের পথ। কলির পথ একা থেকে একা।

আলতা হয়ে

মায়ের পায়ের আলতা হয়ে
থাকিস রাঙ্গা জবা মন
আমি ধূলোয় পড়ে লুটবো
যদি না দিস শ্রীচরণ।

তোর মহামায়ায় পড়ে
একূল ও কূল সব গেলরে
আমির পর্দা সরিয়ে নেরে
কর আমায় আপন

দাস অঞ্জন বলে
পায়ে করে দিসনে ঠেলে
কোলে তুলে নে মা এবার
মোছ অ-সারেতে মন।

চল মন

চল মন বেড়াতে যাবি
দক্ষিণেশ্বরে কালীঘাটে
যেথা রামকৃষ্ণের কথামৃত
অমৃত ধারায় ঝরেছেরে।

যেথা বিবেকানন্দ উদ্বোধিতে
বিশ্ব বিবেক মেতেছেরে
রাণী রাসমণি হয়ে কৃতার্থ
প্রেম-অর্ঘ জেনেছেরে।

কত মন্দির মসজিদাদী
লীন হয়েছে কাল সাগরে
হেথা শতবর্ষ সহস্রে কমলে
মায়ের পায়ে পড়ছে ঢলে।